প্রকৃতিতত্ত্ব-দুর্গা ও লক্ষ্মী

BANGLADARSHAN.COM

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
দুর্গাতত্ত্ব-১	৪
দুর্গাতত্ত্ব-২	৮
দুর্গাতত্ত্ব-৩	১৫
দুর্গাতত্ত্ব-৪	২৫
দুর্গাতত্ত্ব-৫	৩৯
লক্ষ্মীপুজো	৫০

BANGLADARSHAN.COM

॥দুর্গাতত্ত্ব–১॥

দুর্গা বোধন প্রতীক তাৎপর্য:-

****

প্রভাতে য স্মরেনিত্যন্নঙ্গ দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম,
আপদ স্তস্য নাশ্যন্তি তমে সূর্যোদ্যয়ে যথা।

সকালে উঠে যে দুই অক্ষর বিশিষ্ট দুর্গানাম স্মরণ করে তার সমস্ত আপদ নাশ হয়, যেমন তমসাঘন অন্ধকারের পরে সূর্যোদয়ে আলো প্রকাশিত হয়।

হিন্দুশাস্ত্রে "দুর্গা" শব্দটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে:

"দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিত॥"

BANGLA

অর্থাৎ, "দ" অক্ষরটি দৈত্য বিনাশ করে, উ-কার বিঘ্ন নাশ করে, রেফ রোগ নাশ করে, "গ" অক্ষরটি পাপ নাশ করে এবং অ-কার শত্রু নাশ করে। এর অর্থ, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। "অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুম বলেছে, "দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা।" অর্থাৎ, যিনি দুর্গ নামে অসুরকে বধ করেছিলেন, তিনি সব সময় দুর্গা নামে পরিচিত। দেবী পার্বতী দেবগণের অনুরোধে ও শিবের আদেশে এক উগ্র রূপ ধারণ করে দুর্গম অসুরকে বধ করেন তাই তিনি দুর্গা নামে অভিহিত হন।

দুর্গা মূলত শক্তি দেবী। ঋগ্বেদে দুর্গার বর্ণনা নেই, তবে ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তকে দেবী দুর্গার সূক্ত হিসাবেই মান্যতা দেওয়া হয়। দেবী দূর্গা নির্গুণ অবস্থায় এই জগৎসংসারে বিরাজ করেন। তার জন্ম হয়না, আবির্ভাব ঘটে, যাকে বলা হয় প্রাকত্ব। দূর্গা সপ্তশতীতে বর্ণিত আছে, যে মহাশক্তি ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, শিবের শিবত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব প্রদান করেছেন, সেই দেবী দেবতাদের সমষ্টিভূত তেজপুঞ্জ থেকে স্বরূপ ধারণ করেন।

তিনি কখনো বা নৃমুণ্ডমালিনি চামুন্ডা, তিনিই আবার তমোময়ী নিয়তি।শত্রুদহনকালে তিনি অগ্নিবর্ণা, অগ্নিলোচনা। তিনিই জগদীশ্বরী, আপন মহিমায় এই পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন প্রতিটি জীবের শরীরে। তিনি ঘটন-অঘটন পটিয়সী, দূর্গা দুর্গতিনাশিনী। তিনিই জগৎকে চালান ও প্রতিপালন করেন জগদ্ধাত্রী রূপে, আবার প্রলয়কালে তিনিই হয়ে উঠেন প্রলয়ংকারী দেবী কালিকা।

দেবী দুর্গা শাক্ত ধর্মে সর্বোচ্চ আরাধ্য দেবী, বৈষ্ণব ধর্মে তাকে ভগবান বিষ্ণুর অনন্ত মায়া হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয় এবং শৈবধর্মে দুর্গাকে শিবের অর্ধাঙ্গিনী পার্বতী। বৈদিক সাহিত্যে দুর্গার উল্লেখ পাওয়া যায়। কেনোপনিষদে বর্ণিত উমা (পার্বতী) হৈমাবতীকে দুর্গা হিসাবেই আখ্যায়িত করা হয়েছে; ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়াকে দুর্গার

একটি স্বরূপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে যিনি হরির সহায়িনী তথা শিবভক্তিপ্রদায়িনী। এইসমূহ ছাড়াও দুর্গাদেবীর বর্ণনা মহাভারতের বিরাট পর্ব ও অন্যান্য পুরাণে পাওয়া যায়। পার্বতীরূপী দুর্গাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন অবতার সমূহ হল: কালিকা, নন্দা, ভ্রামরী, শাকম্ভরী, রক্তদণ্ডিকা, কৌশিকী ইত্যাদি।

আজ ষষ্ঠী। দেবীর বোধন।

বোধন মানে আমরা জানি দুর্গাপুজো শুরু।

কালিকাপুরাণ আর বৃহদ্ধর্ম পুরাণ বলে রাবণবধে রামকে সাহায্য করতে স্বয়ং ব্রহ্মা রাতে দেবীর বোধন করেছিলেন।

রাতে কেন? কারণ আছে।

সূর্যের দুরকম আয়ন বা চলার পথ। একবার বিষুবরেখা থেকে ধীরে ধীরে উত্তরদিকে যাত্রা যাকে বলে উত্তরায়ন। সময় নেয় পুরো ছমাস। এবার সৌরগতির ছমাস দেবতাদের মাত্র একদিন। দিন বলে তাঁরা জেগে থাকেন। তাই যাবতীয় পুজো অর্চনা এই সময়েই করতে হয়। অন্যদিকে দক্ষিণায়ন মানে বিষুবরেখা ধরে যখন সূর্য দক্ষিণদিকে সরতে থাকে। সময় নেয় সেই ছমাস। দেবতাদের কাছে মাত্র একটা রাত। রাত বলে ঘুমিয়ে থাকেন বা বিশ্রামকাল। এ সময় পুজোটুজো করা মানে ঘুমে ব্যাঘাত করা। ফলে শাস্ত্র এই সময় পুজোর বিধান দেয় না। ঘুমন্ত দেবতারা পুজো নেবেন কী করে!

কিন্তু রামচন্দ্রের কোন উপায় ছিল না। অশুভ শক্তির প্রতীক রাবণকে বধ করতেই হবে। রাবণবধে দেবীর সাহায্য তো অবশ্য চাই। দেবী তো ঘুমিয়ে। কী করেন তিনি? এগিয়ে এলেন ব্রহ্মা। আসতে তো হবেই। দুর্গার সৃষ্টিতে তাঁরও যোগদান আছে। দেবীর হাতের পদ্ম তাঁর দেওয়া। পদ্ম হল জ্ঞান। জ্ঞান দেয় আসল মুক্তি।

ব্রহ্মা অনেক স্তুতি করলেন। হে দেবী, রাবণবধের জন্য রামকে অনুগ্রহ করুন ও জেগে উঠুন। এই ঘুম থেকে জাগানোর প্রক্রিয়াকে বলে বোধন। ব্রহ্মার স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে দেবী বেলগাছের একটা পাতায় কুমারী কন্যা হয়ে আবির্ভূতা হলেন। সেটা স্মরণ করে ষষ্ঠীর গোধূলি লগ্নে বেলগাছের তলায় বোধন হয়।

সকালে মণ্ডপে একটা ঘট স্থাপন করা হয় তা হল কল্পারম্ভ। কল্প মানে সংকল্প। আরম্ভ মানে শুরু। অর্থাৎ যে মুহূর্তে সংকল্প বা শপথ নেওয়া হয় তাই কল্পারম্ভ। পুজোর চারদিন নিষ্ঠার সাথে পুজো করার শপথ। ষষ্ঠীর সকালেই কল্পারম্ভ হবে-তার কোন মানে নেই। কল্পারম্ভ তিন প্রকার-নবম্যাদি, প্রতিপদাদি আর ষষ্ঠ্যাদি। বহু আশ্রমে যেমন প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ। তবে বেশিরভাগ জায়গায় ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভই হয়। দুর্গাপুজোর একটি ঘট কল্পারম্ভ ঘট। ঘটের চারপাশে চারটে কঞ্চির মাথা লাল সুতোর বেড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। বিশ্বাস এই গণ্ডিতে কোন অশুভ শক্তি ঢুকতে পারবে না। পুজো নির্বিঘ্নে শেষ হবে ।

এরপর হয় আমন্ত্রণ ও অধিবাস। সুদূর কৈলাশ থেকে তিনি যে এতটা পথ পাড়ি দেন তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এগুলো করা হয়। এর অর্থ হল নেমন্তন্ন করে পুজো গ্রহণ করার আবেদন।

সন্ধেবেলা পুরোহিত বোধনের মন্ত্র উচ্চারণ করেন,

বোধনং বিল্বশাখায়াং সায়ং ষষ্ঠ্যাং সমাচরেৎ ।

তত্র সায়ং বিল্বতরোর্মূলে বদ্ধাননঃ সুধীঃ॥...

সকালে ঘট বসানোর সময় ঢাকি ঢাক বাজায়। সেই প্রথম ঢাকে কাঠি পড়ে। ব্যস,শুরু হয়ে যায় পুজো। মহাসপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নান করানো হয়, নবপত্রিকা মানে নটা গাছ কলা, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মান, কচু আর ধান উদ্ভিদ জগতের প্রতিনিধি। কলাগাছে একজোড়া বেল, সাদা অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে আর সব পাতাগুলো পোটলা করে বেঁধে লালপাড় শাড়ি পরানো, শাকম্ভরি মায়ের পূজা। নবপত্রিকার ৯টি উদ্ভিদ আসলে দুর্গার ৯টি বিশেষ রূপের প্রতীকরূপে কল্পিত হয়। এই ৯ দেবী হলেন রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কচ্বাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা ও ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এই নয় দেবী একত্রে "নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা" নামে নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজিতা হন।

মহাসপ্তমীর দিন সকালে নিকটস্থ নদী বা কোনো জলাশয়ে (নদী বা জলাশয়ে না থাকলে কোনো মন্দিরে) নিয়ে যাওয়া হয়। পুরোহিত নিজেই কাঁধে করে নবপত্রিকা নিয়ে যান। তাঁর পিছন পিছন ঢাকীরা ঢাক বাজাতে বাজাতে এবং মহিলারা শঙ্খ ও উলুধ্বনি করতে করতে যান। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী স্নান করানোর পর নবপত্রিকাকে নতুন শাড়ি পরানো হয়। তারপর পূজামণ্ডপে নিয়ে এসে নবপত্রিকাকে দেবীর ডান দিকে একটি কাষ্ঠসিংহাসনে স্থাপন করা হয়। পূজামণ্ডপে নবপত্রিকা প্রবেশের মাধ্যমে দুর্গাপূজার মূল অনুষ্ঠানটির প্রথাগত সূচনা হয়। নবপত্রিকা প্রবেশের পর দর্পণে দেবীকে মহাস্নান করানো হয়। এরপর বাকি দিনগুলিতে নবপত্রিকা প্রতিমাস্থ দেবদেবীদের সঙ্গেই পূজিত হতে থাকে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল, নবপত্রিকা প্রবেশের পূর্বে পত্রিকার সম্মুখে দেবী চামুণ্ডার আবাহন ও পূজা করা হয়। পত্রিকাস্থ অপর কোনো দেবীকে পৃথকভাবে পূজা করা হয় না।

গবেষকদের মতে, নবপত্রিকার পূজা প্রকৃতপক্ষে শস্যদেবীর পূজা। অনেকেই মনে করেন, এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক রূপে গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজার মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।... বলাবাহুল্য এই সবই হল পৌরাণিক দুর্গার সঙ্গে এই শস্যদেবীকে মিলিয়ে দেওয়ার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপুজোর ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পুজো অনেকখানি মিশে রয়েছে।

প্রাণী আর উদ্ভিদ সংরক্ষণের পূজা, ঘট প্রতিষ্ঠা মানে দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘট প্রতীক হল জঠর বা womb এর. তারভেতরে পবিত্র জলে প্রাণ, যাঁর মুখে পল্লবিত সবুজ নবমুকুলিত পত্র।

আলপনা তন্ত্র মতে যন্ত্র যার কেন্দ্রে থাকে পদ্ম, পদ্ম হল যোনির প্রতীক. নিচের দিক থেকে দেখলে চিত্রিত পদ্মযোনি, জঠর-কলস পবিত্র জল, তার ওপরে পল্লব, আর সেটা মা তার সন্তান।

"মধুর মধুর ধ্বনি বাজে, হৃদয় কমল বন মাঝে।
এসো দেবী এসো এ আলোকে,
একবার তোকে দেখি চোখে।"

এসো দেবী হৃদয় কমল বনে ধ্যানে বোধিতা হয়ে পরমাপ্রকৃতিরূপিণী, সর্বতত্ত্বস্বরূপা।

॥দুর্গাতত্ত্ব–২॥

দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী তাৎপর্য:-

****

"দশকরধারিণী শঙ্করী শুভদে
হরিহর বিধিনুত মঙ্গল বরদে
জয় জগদ্বীশ্বরী শাম্ভবী বিমলে
মম নতিরেষা তব পদ কমলে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন প্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে তিনটি জিনিসের দরকার,-"প্রথম পূজারীর ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি।" আধুনিক কালের পূজাতে সেই ভক্তির অভাব অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। প্রতিমা পূজার প্রধান অঙ্গ হল প্রতিমা, সেই প্রতিমা সুন্দর না হলে পূজার সার্থকতা থাকে না, আবার প্রতিমা ধ্যানাযায়ী না হলে পূজারীর কাছে পূজা করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। পূজার সাত্বিকতা হারিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তা রাজসিকতা ও তামসিকতায় পরিনত হয়েছে। মাতৃ আরাধনার প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা তারই আনুসঙ্গিকতায় অধিক মনোনিবেশ করেছি। আজকাল দেবী প্রতিমা আমাদের কাছে মনোরঞ্জনের এক বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, অধিকাংশ স্থানে মূর্তি তৈরি করা হয় বিভিন্ন আদলে•••বিভিন্ন রূপে যার ফলে আমরা নিজেরা মাতৃরূপ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে যাই। সত্যি কথা বলতে কি আমরা অনেকেই জানি না আমাদের জগন্মাতা দেবী দুর্গার প্রকৃত স্বরূপ কি? ধ্যানে আমরা দেবীর শুধু রূপের বর্ণানাই পাই না, মায়ের কোন হস্তে কোন অস্ত্র তারও বর্ণনা আছে। সেই অস্ত্রের তাৎপর্যও আছে। সকলের জ্ঞাতার্থে দেবীর ধ্যান মন্ত্র ও তার যথাসাধ্য অর্থ সকলের কাছে তুলে ধরছি গুরু কৃপায় যেটুকু বুঝেছি সেই ভাবে।

দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্র:-

****

ও হ্রীং জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননা॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনা
(তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনা)
নবযৌবন-সম্পন্নাং সব্বাভরণ-ভূষিতাম্।
সূচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নত-পয়োধরা
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনী।
মৃণালায়াত-সংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্।

ত্রিশুলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং-চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথাশক্তিং দক্ষিণেন বিচিন্তয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশঙ্কুশমেবচ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্থান্মহিষং তদ্বদ্ধিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরোচ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিন
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্য্যদন্ত্রবিভূষিত।
রক্তারক্তী কৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণা
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রুকুটিভীষণানন।
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বধিরবঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পদং সমং সিংহোপরিস্থিত
কিঞ্চিদূর্ধং তথা বামমসুষ্ঠং মহিষোপরি॥
স্তয়মানঞ্চ তদ্রুপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকাম ফলপ্রদাং॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডগ্রাচণ্ডনায়িকা।
চণ্ডাচণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততঃ পরিবেষ্টিতা
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম।

BANGL

ব্যাখ্যা।

দেবীর মাথায় জটা, সাথে অর্ধচন্দ্রের মত কপাল। পূর্ণিমার চাদের মত মুখ তার ও গায়ের রঙ অতসীফুলের মতো (মতান্তরে তপ্ত কাঞ্চনের বা সোনার মত)। তিনি সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত এবং তার সর্বাঙ্গ বিভিন্ন অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত। তাঁর দাঁত সুন্দর এবং ধারালো, স্তন সম্পূর্ণ। তিন ভাজে দাঁড়িয়ে তিনি দৈত্য নিধন করছেন। দশহাতভর্তি অস্ত্র বা আয়ুধ তার যা দেখতে শাখা-প্রশাখা সমন্বিত পদ্ম গাছের মতো। ডানদিকের উপরের হাতে অবস্থান করে ত্রিশুল, তারপর ক্রমান্বয়ে খড়্গ এবং চক্র।

দেবীর দক্ষিণের সর্বনিম্ন দুই হাতের অস্ত্র ধারালো তীর এবং বর্শা। দেবীর ধ্যানে বর্ণিত হয় তাঁর বাঁ হস্ত। সেদিকে সবচেয়ে নিচের হাতে থাকে চামড়ার ঢাল ও তার উপরের হাতে ধনুক। সেগুলির উপরের হাতে থাকে সর্প, অঙ্কুশ এবং কুঠার (ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে)। দেবীর পায়ের কাছে দৈত্যরাজের মাথার স্থান।

মহিষের কাটা মাথা থেকে মহিসাসুরের দেহ অর্ধেক উত্থাপিত, হাতে তার খড়্গ এবং হৃদয়ে দেবীর ত্রিশূল দ্বারা বিদ্ধ। তার পেট থেকে নাড়িভূঁড়ি নির্গত হয়েছে। শরীর রক্তলিপ্ত। দেবীর হাতে ধরা সাপ দ্বারা অসুরের দেহ বেষ্টিত। তবে কুঞ্চিত ভ্রূতে দৈত্যের রূপও ভয়ঙ্কর।

দেবী তার বাম হাত দিয়ে দৈত্যরাজের চুল টেনে রেখেছেন। দেবীর ডান পা বাহন সিংহের উপরে এবং বাঁ পা কিঞ্চিৎ উর্ধে মহিষের উপরে অবস্থান করে। প্রবল যুদ্ধরত অবস্থাতেও দেবী তার শান্তিপূর্ণ মুখাব্যব ও আশীর্বাদী রূপ বজায় রেখেছেন এবং সমস্ত দেবতা দেবীর এই রূপের স্তুতি করেন।

দেবীর উপরোক্ত রূপ দেবতাদের আট প্রচন্ডশক্তি উগ্রচন্ডা, প্রচন্ডা, চন্ডোগ্রা, চন্ডনায়িকা, চন্ডা, চন্ডবতী, চন্ডরূপ ও অতিচন্ডিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। গৃহকর্তার মানব জীবনের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেন এই দেবী। তাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের জন্য জগন্মাতৃকা। দেবী দুর্গার ধ্যানই মানবজাতির করা উচিত॥

অসুর বধের জন্য স্বর্গের দেবতারা দেবীর দশ হাতে তুলে দিয়েছিলেন মোট দশটি অস্ত্র।

ত্রিশূল (Trident or Trishul)

দেবী দুর্গার হাতে ত্রিশূল তুলে দিয়েছিলেন মহাদেব। ত্রিশূলের তিনটি ফলা তিন মানব গুণকে ব্যাখ্যা করে-তমঃ, রজঃ এবং সত্ত্ব।

শঙ্খ (Conch)

বরুণ, দেবী দুর্গার হাতে শঙ্খ তুলে দিয়েছিলেন। শঙ্খকে সৃষ্টির প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়। পুরাণ অনুযায়ী শঙ্খ থেকে উৎপন্ন শব্দ বা কম্পন থেকেই প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্যেই দুর্গাকে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করা হয়, আরেক নাম তাঁর তাই কাম্পিল্যবাসিনী। শঙ্খ একই সঙ্গে জাগরণের প্রতীক।

সুদর্শন চক্র (Discus or Sudarshan Chakra)

মহামায়ার হাতে সুদর্শন চক্র তুলে দিয়েছিলেন বিষ্ণু। চক্র অর্থাৎ আবর্তন। তাই তাঁকে এই চক্র প্রদান করার অর্থ দেবীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে চলেছে গোটা বিশ্ব। সুদর্শন চক্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অপার সৌন্দর্যের প্রতীক।

বজ্রাস্ত্র বা অশনি (Thunderbolt or Vajra)

মহামায়ার হাতে বজ্র তুলে দিয়েছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। এটি অশনি দৃঢ়তা ও সংহতির প্রতীক। নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হন মানুষ, এই দুই গুণের মাধ্যমেই।

পদ্ম (Lotus)

ব্রহ্মা, পদ্ম তুলে দিয়েছিলেন দেবী দুর্গার হাতে। পদ্ম জ্ঞানকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এর অর্থ জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি। দেবীও অন্ধকারের মধ্যে থেকে আলোর দিশা দেখিয়েছিলেন এভাবেই। পাঁকের মধ্যে জন্মানো সত্ত্বেও পদ্মের রূপ মুগ্ধ করে সকলকে। তাই মায়ের হাতে পদ্ম থাকার অর্থ হল, মায়ের আশীর্বাদে যেন অসুরকূলও তাঁদের ভিতরের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়। পদ্ম সর্বশক্তির আধার।

গদা (Mace)

যমরাজ প্রদান করেছিলেন গদা বা কালদণ্ড। এটিকে মূলত ভক্তি, আনুগত্য ও ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়। মহাকালের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক এই গদা দেবীর হাতে বিশ্বের সম্মোহিনী শক্তি হিসেবে কাজ করে।

খড়্গ (Curved Sword)

খড়্গ বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার প্রতীক। এই অস্ত্রটি সাধারণত এমন ব্যক্তিরা বহন করেন, যাদের দায়িত্বজ্ঞান এবং বোঝার ক্ষমতা রয়েছে। খড়্গ বা তলোয়ারের ধার আসলে মানুষের মগজাস্ত্রের বুদ্ধির ধার। আর এই ধার দিয়েই যাতে সমাজের সমস্ত বৈষম্য ও অশুভকে মানুষ জয় করতে পারে। সেই বার্তাই বহন করেন মা দুর্গার হাতের খড়্গ বা তলোয়ার।

অগ্নি (Fire)

অগ্নি বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রতীক। অগ্নিদেব এটি দেবীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

সাপ (Snake)

দেবী দুর্গাকে শেষ নাগ প্রদান করেছিলেন নাগ। যদিও দুর্গার অনেক ছবিতে আশীর্বাদরত অবস্থায় একটি হাত খালি দেখায়। অথবা মহিষাসুরকে বধ করার জন্য ত্রিশূল ধরে থাকেন তিনি। দশম হাতে আসলে একটি সাপ ধরার কথা। এটি চেতনা এবং শিবের পুরুষালী শক্তির প্রতীক।

তীর ও ধনুক (Bow and Arrows)

পবনদেব দিয়েছিলেন তীরও ধনুক। উভয়ই ইতিবাচক শক্তির প্রতীক। মনুষ্য শরীরের ভিতরে যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে তারই প্রকাশ ঘটে ধনুর টঙ্কারে। আর এই ধনুর টঙ্কারের সঙ্গে জুড়ে থাকে তীর যা এই ধনুর টঙ্কারে প্রকাশিত শক্তির ভারকে বহন করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত হানে। মানব দেহে সেই শক্তির সঞ্চার করতেই মা দুর্গা নিজের হাতে তীর-ধনুক বহন করেন। আবার যৌগিক ভাবে, শ্বাসরূপ তীর দিয়ে সাধনার জ্যা রোপন করে তীর নিঃক্ষেপ করে বাসনার অস্থির প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় স্থির করে প্রাণবায়ুকে যাতে মায়ের ধ্যানমূর্তি প্রকটিত হয় আজ্ঞাচক্রে। অস্থির প্রাণে মায়ের জ্যোতিরূপ অধরা থাকে, স্থির প্রাণ হলেই দর্শন হবে মায়ের জ্যোতিরূপ বিন্দুর।

ঘন্টা (Bell)

এছাড়াও দেবীর বাম হাতে থাকে ঘণ্টা। কথিত আছে, দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত দেবী দুর্গাকে এই ঘণ্টা দিয়েছিলেন। ঘণ্টা ধ্বনি অসুরদের তেজকে দুর্বল করে। প্রজাপতি প্রদান করেছিলেন অক্ষমালা। ব্রহ্মা, কমণ্ডলুও দিয়েছিলেন দেবীকে। বিশ্বকর্মা দেবীকে, অতি নির্মল পরশু, নানাবিধ অস্ত্রসমূহ এবং অভেদ্য বর্ম প্রদান করেন।

সিংহ (Lion)

দুর্গার বাহন সিংহকে অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় না সাধারণত। তবে সিংহ শক্তির প্রতীক। তাই অনেকে মনে করেন সিংহ আসলে দুর্গার শক্তিশালী এক অস্ত্রের চেয়ে কম কিছু নয়।

শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর এইগান দিয়ে প্রণাম জানাই মাকে।

দুর্গাসতী ভগবতী সহস্রারে অম্বিকা,
কালরাত্রি সিদ্ধিদাত্রী, ধ্যানে তারা, কালিকা।
পরমাশক্তি জগদ্ধাত্রী ভৈরবী দক্ষিণাকালিকা,
আদ্যাশক্তি মহাশক্তি বিশ্ব জগতপালিকা।
পরমাবিদ্যা মহামতি সারদা ষোড়শী বালিকা,
মহাকালী, মহারাত্রি,দারুণা, সৌম্যা, করালিকা।
পরমাছন্দা, ঋতুস্পন্দা, কাম্পিল্যবাসিনী দেবীকা,
হৃদকমলে কমলাবালা,সৌম্যাকলা দীপিকা।

ভগবতী দুর্গাশক্তির বাস প্রতি মনুষ্য ঘটে, সহস্ররারে অধিষ্ঠিতা অম্বিকা শক্তি, কালরাত্রি শক্তি দান করেন সিদ্ধি, ধ্যানগম্যরূপ তারা আর কালিকা শক্তির। পরমাপ্রকৃতি শক্তি জগদ্ধাত্রী, ভৈরবী, দক্ষিণাকালিকা আর মহাশক্তিস্বরূপা আদ্যাশক্তি বিশ্ব জগতের পালিকা শক্তি। পরমাবিদ্যা বা মহাবিদ্যা সারদা বা ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরী, মহাকালী হলেন মহারাত্রির শক্তি যিনি একই সঙ্গে দারুণা, করালরূপা করালিকা আবার ক্ষেত্র বিশেষে সৌম্যা মুরতি। পরমাছন্দা প্রতি ঋতুতে যাঁর স্পন্দন অনুভূত হয় তিনি দেবীকা কাম্পিল্যবাসিনী, কম্পন দিয়েই যিনি জগৎ সৃষ্টি, পালন, লয় করছেন আবার হৃদকমলে কমলাবালা বা কমলে কামিনী (যাঁর কথা কমলাকান্তের গানে পাই হৃদি সরোবরে কমলে কামিনী বিরাজে রয়) অধিষ্ঠান করে সাধকের যিনি সৌম্যাকলা দীপিকা বা দীপের আলোক মুরতির ন্যায় স্নিগ্ধ।

আজকে মহা সপ্তমী।

মহাসপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নান করানো হয়, নবপত্রিকা মানে নটা গাছ কলা, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মান, কচু আর ধান উদ্ভিদ জগতের প্রতিনিধি। কলাগাছে একজোড়া বেল, সাদা অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে আর সব পাতাগুলো পোটলা করে বেঁধে লালপাড় শাড়ি পরানো, শাকম্ভরি মায়ের পূজা। নবপত্রিকার ৯টি উদ্ভিদ আসলে দুর্গার ৯টি বিশেষ রূপের প্রতীকরূপে কল্পিত হয়। এই ৯ দেবী হলেন রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কচ্বাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা ও ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এই নয় দেবী একত্রে “নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা” নামে নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজিতা হন।

মহাসপ্তমীর দিন সকালে নিকটস্থ নদী বা কোনো জলাশয়ে (নদী বা জলাশয়ে না থাকলে কোনো মন্দিরে) নিয়ে যাওয়া হয়। পুরোহিত নিজেই কাঁধে করে নবপত্রিকা নিয়ে যান। তাঁর পিছন পিছন ঢাকীরা ঢাক বাজাতে বাজাতে

এবং মহিলারা শঙ্খ ও উলুধ্বনি করতে করতে যান। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী স্নান করানোর পর নবপত্রিকাকে নতুন শাড়ি পরানো হয়। তারপর পূজামণ্ডপে নিয়ে এসে নবপত্রিকাকে দেবীর ডান দিকে একটি কাষ্ঠসিংহাসনে স্থাপন করা হয়। পূজামণ্ডপে নবপত্রিকা প্রবেশের মাধ্যমে দুর্গাপূজার মূল অনুষ্ঠানটির প্রথাগত সূচনা হয়। নবপত্রিকা প্রবেশের পর দর্পণে দেবীকে মহাস্নান করানো হয়। এরপর বাকি দিনগুলিতে নবপত্রিকা প্রতিমাস্থ দেবদেবীদের সঙ্গেই পূজিত হতে থাকে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল, নবপত্রিকা প্রবেশের পূর্বে পত্রিকার সম্মুখে দেবী চামুণ্ডার আবাহন ও পূজা করা হয়। পত্রিকাস্থ অপর কোনো দেবীকে পৃথকভাবে পূজা করা হয় না।

গবেষকদের মতে, নবপত্রিকার পূজা প্রকৃতপক্ষে শস্যদেবীর পূজা। অনেকেই মনে করেন, এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক রূপে গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজার মূলে বোধহয় এই শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।... বলাবাহুল্য এই সবই হল পৌরাণিক দুর্গার সঙ্গে এই শস্যদেবীকে মিলিয়ে দেওয়ার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপুজোর ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পুজো অনেকখানি মিশে রয়েছে।

মহাসপ্তমীর পূজার শেষে পাঠ্য স্তোত্রটি ও তার অর্থটি জানি। এই মা দুর্গার স্তোত্রটিতে ছয়টি শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোকটি হল-

BANGI

ওঁ ঐং দুর্গাং শিবাং শান্তিকারীং
ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্ ।
সর্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাম্বিকাম্॥

অর্থাৎ মঙ্গলময়ী, শক্তিদায়িনী, ব্রহ্মাণী, পরমেশ্বর শিবের ঘরণী, সমস্ত লোককে যিনি কর্মে উদ্বুদ্ধ করেন সেই অম্বিকা দুর্গাকে আমি সদা সর্বদা প্রণাম করি। দ্বিতীয় শ্লোকটি হচ্ছে-

মঙ্গলাং শোভানাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥

এই শ্লোকটির অর্থ হল মঙ্গলদায়িনী, অপূর্ব সুন্দরী, পবিত্রা শুদ্ধা, যিনি অখন্ড, যিনি পরমেশ্বর এর শ্রেষ্ঠ অংশ, জগদীশ্বরী, সকল জীবের অন্তশ্চারিণী দেবী চন্ডিকাকে আমি প্রণাম করি। তৃতীয় শ্লোকটি হল-

সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বলোকভয়াপহাম্।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাম্॥

সমস্ত দেবদেবী যাঁর মধ্যে একত্রীভূত, যিনি সকল লোকের ভয় বিনাশ করে থাকেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও যাঁর স্তুতি করেন সেই দেবী উমাকে আমি সদা সর্বদা প্রণাম করি। পরের শ্লোকটি হল-

বিন্ধ্যস্থাং বিশ্বনিলায়াং দিব্যস্থাননিবাসিনীম্।
যোগিনীং যোগমায়াঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥

এর মানে হল যিনি বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করেন, যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ আধার, যিনি পরমলোকে অর্থাৎ স্বর্গে বাস করেন, যিনি যোগী রূপ ধারণ করে থাকেন, সেই যোগমায়া চন্ডিকাকে আমি প্রণাম করি। পঞ্চম শ্লোকটি হল-

ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াম্।
প্রণতোহস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্॥

যিনি দেবাদিদেব মহাদেবের বিভূতি স্বরূপিনী, ঈশ্বরী, মহাদেবের পত্নী, যিনি সংসার সাগর থেকে আমাদেরকে দয়া করে উত্তীর্ণ করেন সেই দেবী দুর্গাকে আমি সর্বদা প্রণাম করি। ষষ্ঠ শ্লোকটি হল-

য ইদং পঠতি স্তোত্রং শৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিতঃ।
স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যা মোদতে দুর্গয়া সহ॥ ঐং॥

যিনি ভক্তির সঙ্গে এই দুর্গা স্তোত্রটি পাঠ করেন বা ভক্তি সহকারে মা দুর্গার স্তোত্রটি শোনেন, তিনি সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে দেবী দুর্গার সান্নিধ্য সুখ অনুভব করেন।

জয় দুর্গা দুর্গতিহারিণী নমঃ

॥দুর্গাতত্ত্ব–৩॥

মহাষ্টমী বা দুর্গাষ্টমী ও দুর্গামূর্তি গড়ার কথা:-

****

আজকে মহাষ্টমী, মায়ের অঞ্জলি মন্ত্র দিয়ে শুরু করলাম আজকের দুর্গাতত্ত্ব।

বিষ্ণু স্মরণ মন্ত্র:-

****

নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

দুর্গা অষ্টমী পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র:

[মন্ত্র ১]

নমঃ মহিষগ্নি মহামায়ে চামুন্ডে মুন্ডমালিনি।
আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবী নমোহস্তুতে॥

এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ নমঃ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

[মন্ত্র ২]

নমঃ কালী কালী মহাকালী কালীকে পাপহারিণী।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষদে দেবী নারায়ণী নমোহস্তুতে।

এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ নমঃ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

[প্রণাম মন্ত্র]

নমঃ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্রোম্বকেগৌরি নারায়ণী নমোহস্তুতে।
নমঃ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোহস্তুতে॥
নমঃ শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়েণে।
সর্ব্বস্যার্তিহরে দেবী নারায়ণী নমোহস্তুতে।

এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ নমঃ দক্ষযজ্ঞ বিনাশিন্যে মহাঘোরায়ৈ যোগিনী কোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ভগবত্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥

নমঃ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে।।

দেবীর ধ্যান মন্ত্রঃ-

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলীবন্ধেন্দুরেখাম্।
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি
করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্ ।
সিংহাস্কন্ধাধিরুঢ়াং ত্রিভুবন–মখিলং
তেজসা পুরয়ন্তীম্ ।
ধ্যায়েদ্ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং
সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

এর অর্থ-কালাভ্র আভাং (এর অর্থ দুই প্রকার হয়, একটি স্বর্ণ বর্ণা অপরটি কালো মেঘের ন্যায়), কটাক্ষে শত্রুকূলত্রাসিণী, কপালে চন্দ্রকলা শোভিতা, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল ধারিণী, ত্রিনয়না, সিংহোপরি সংস্থিতা, সমগ্র ত্রিভুবন স্বীয় তেজে পূর্ণকারিণী, দেবগণ-পরিবৃতা।

সিদ্ধসঙ্ঘ সেবিতা জয় দুর্গার ধ্যান করি। এই জয়দুর্গা বা কৌশিকীদেবী, বিপদতারিনীদুর্গা। তিনি পঞ্চদেবতার একজন।

এই দেবী যুদ্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরের বধ করেছিলেন। এই দেবী মোহাচ্ছন্ন শুম্ভাসুরকে অদ্বৈত জ্ঞান দান করে বলেছিলেন-

"ঐকেবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্তো মদবিভূতয়ঃ॥"

(এই জগতে এক আমিই আছি। আমি ছাড়া আমার সাহায্যকারিনী আর কে আছে? ওরে দুষ্ট ভাল করে দেখ, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তি আমারই অভিন্না বিভুতি বা শক্তি। এই দেখ তারা আমার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে)
একটি পৌরাণিক গাথানুসারে একদা ভগবান মহাদেব রহস্যচ্ছলে দেবী পার্বতীকে 'কালী' বলে উপহাস করেন। এতে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে তপস্যার মাধ্যমে নিজের "কৃষ্ণবর্ণা" রূপ পরিত্যাগ করলেন। সেই কৃষ্ণবর্ণা স্বরূপ দেবীই হলেন, দেবীর পার্বতীর অঙ্গ থেকে সৃষ্টা জয়দুর্গা, কৌশিকীদেবী ও বিপদতারিনীদুর্গা।

প্রত্যেক দেবতা নিজ নিজ তেজ ত্যাগ করে একটি নারীমূর্তি সৃষ্টি করবেন। এরপর সমবেত দেবতারা তেজ ত্যাগ করতে আরম্ভ করেন। একাধিক দেবতার তেজ থেকেই তৈরি হল দশভুজা দুর্গা। কোন দেবতার তেজ থেকে এই নারী মূর্তির শরীরের বিভিন্ন অংশ তৈরি হল তা দেখে নেওয়া যাক এবার। মহাদেবের তেজে মুখ, যমের তেজে চুল, বিষ্ণুর তেজে বাহু, চন্দ্রের তেজে স্তন, ইন্দ্রের তেজে কটিদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, সূর্যের তেজে পায়ের আঙুল, বসুগণের তেজে হাতের আঙুল, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দাঁত, অগ্নির তেজে ত্রিনয়ন, সন্ধ্যার তেজে ভ্রু, বায়ুর তেজে কান এবং অন্যান্য দেবতার তেজে শিবারূপী দুর্গার সৃষ্টি হল।

দুর্গাষ্টমী:-

দুর্গাপূজার মহাষ্টমী তিথি মহামায়ার খুব প্রিয় তিথি। আদিশক্তি মহামায়ার প্রথম পুজো করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সে দিন ছিল বাসন্তী শুক্লা অষ্টমী। ত্রেতাযুগে ভগবান বিষ্ণু রামচন্দ্ররূপে জন্ম নিয়েছিলেন বাসন্তী শুক্লা অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে। আবার তিনিই কৃষ্ণ রূপে জন্ম নিলেন ভাদ্র মাসের অষ্টমীতে।

অষ্টমী তিথি হলো অসুরবিনাশী শুদ্ধসত্তার আবির্ভাব তিথি। অষ্টমী তিথিতে দেবী মহালক্ষ্মীরূপা বৈষ্ণবী শক্তি। দেবীর সেদিন রাজরাজেশ্বরী মূর্তি। দু'হাতে বর দেন ভক্তদের। শ্রেষ্ঠ উপাচার সেদিন নিবেদিত হয়। পদ্ম, জবা, অপরাজিতা, বেলপাতা—কত রকমের ফুলমালায় দেবীকে সাজানো হয়। অষ্টমীপুজো হল দুর্গোৎসবের পাঁচটি দিনের মধ্যমণি। আবার ওই একটি দিনেই সংহত হয়ে রয়েছে পাঁচ দিনের পুজোর নির্যাস। অষ্টমীতে পুজোর বাহুল্য বেশি। এদিন ৬৪ যোগিনী, কোটি যোগিনী, নবদুর্গা প্রমুখের আরাধনা হয়ে থাকে। এদিন ভক্তেরা দেবীকে প্রার্থনা জানিয়ে বলেন—"নমস্যামি জগদ্ধাত্রি ত্বামহং বিশ্বভাবিনি।"

অষ্টমীতে কুমারী পুজো কেন হয়?

সেকালে মুনিঋষিরা কুমারীপুজোর মাধ্যমে প্রকৃতিকে পুজো করতেন। প্রকৃতি মানে নারী। সেই প্রকৃতিরই আর এক রূপ কুমারীদের মধ্যে দেখতে পেতেন তাঁরা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের প্রভাব। কারণ মানুষ চৈতন্যযুক্ত। আর যাঁদের সৎ মন কলুষতামুক্ত, তাঁদের মধ্যে আবার ঈশ্বরের প্রকাশ প্রকট। কুমারীদের মধ্যে এই গুণগুলি থাকে মনে করেই তাদের বেছে নেওয়া হয় এই পুজোর দেবী হিসেবে। পুজো করা হয় অষ্টমী তিথিতে।

কারা কুমারী পুজোর যোগ্য?

শাস্ত্র অনুসারে সাধারণত এক বছর থেকে ১৬ বছরের অজাতপুষ্প সুলক্ষণা কুমারীকে পুজোর উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ অবিবাহিত কন্যা অথবা অন্য গোত্রের অবিবাহিত কন্যাকেও পুজো করার বিধান রয়েছে। বয়স অনুযায়ী কুমারীদের বিভিন্ন নামেও অভিহিত করা হয়। এক বছরের মেয়ে 'সন্ধ্যা', সাত বছরের মেয়ে 'মালিনী', বারো বছরের কন্যা 'ভৈরবী' এবং ষোলো বছরের মেয়েকে 'অম্বিকা' নামে ডাকা হয়। এই পুজো দেখতে দর্শনার্থীদের ঢল নামে সাবেকি বাড়ির পুজোয় বা মণ্ডপে মণ্ডপে।

সন্ধিপুজো

মহিষাসুর বধের জন্য অর্থাৎ অশুভ শক্তি বিনাশের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ত্রিবিধ শক্তি-সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতীক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এলেন যোগীশ্রেষ্ঠ মুনিবর ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে। ঋষি কাত্যায়ন শুনলেন বৃত্তান্ত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অশুভ আসুরিক শক্তির প্রভাব ও তার দাম্ভিক পাশবিক অত্যাচারের সবিস্তার বিবরণ প্রকাশ করতে করতে দেবাদিদেব মহাদেবের ভ্রূকুটি সংকুচিত হতে লাগল, মুখমণ্ডল শ্বেতশুভ্র থেকে রক্তবর্ণ হতে লাগল, শংখ-চক্র-পদ্ম-গদাধারী শ্রীবিষ্ণুর ত্রিনয়ন হয়ে উঠল রক্তনয়ন আর পদ্মযোনি ব্রহ্মার চতুর্মুখ ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এই ত্রিদেবের সর্বাঙ্গ থেকে মহাতেজ বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

একই সঙ্গে মহাঋষি কাত্যায়নের সারা অঙ্গ থেকে তেজপুঞ্জ রাশিকৃত হতে লাগল। কাত্যায়নের সেই হিমালয়স্থিত অগম্য ও অত্যন্ত গুঢ় আশ্রমে তিন দেবতা ও ঋষির সমূহ তেজঃরাশির সম্মিলিত রূপ থেকে জন্ম নীল এক নারীমূর্তি। সেই দেবী নারীমূর্তি স্পষ্ট হয়েই বিলীন হয়ে গেলেন ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে লালিতাপালিতা ঋষিবরের বালিকা-কন্যার শরীরের মধ্যে। যে বালিকা কাত্যায়নের কন্যা বলে পরিচিতা এবং তাঁর নাম 'কাত্যায়নী।'

উপস্থিত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং অন্য দেবতাগণ সহ ঋষি কাত্যায়ন সেই বালিকারূপী দেবীর আরাধনা স্তব শুরু করলেন। সে এক মহাসাত্ত্বিক, মহাজাগতিক, মহাআধ্যাত্মিক, মহাযৌগিক আরাধনার আবাহন। ব্রহ্মাণ্ডের দশ দিক আলোকিত স্বর্গীয় সুষমায়। নীরব-গভীর মন্ত্রের, ধ্যানের ধেয়ানে দশ দিশা প্লাবিত। ধ্যানমগ্ন সমস্ত দেবতা ও ঋষি দৈববাণীতে জানতে পারলেন যে মহামায়া আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গা 'কাত্যায়নী' রূপে প্রকট হবেন সেই মহামঙ্গলদায়ক মহাশুভ মুহূর্তে, যে মুহূর্তটি হল মহাষ্টমীর অন্তিম ষাট পল এবং মহানবমীর অগ্র ষাট পলের 'সন্ধিক্ষণ।'

ঋষি কাত্যায়ন প্রথমে এই দৈববাণীর কথা প্রকাশ করে দেবতাদের বললেন, মহাষ্টমীর অন্তিম ষাট পল এবং মহানবমীর অগ্র ষাট পলের সম্মিলিত একশো কুড়ি পলে কন্যা কাত্যায়নীর মধ্যেই মা দুর্গা প্রকটিত হবেন এবং তিনিই মহিষাসুর তথা অশুভ দাম্ভিক শক্তিকে বিনাশ করবেন। তাই সেই দেবীকে আরাধনা করা হোক সর্ব উপাচারে। এই মুহূর্তটিতেই দেবীর 'সন্ধিপূজা' হয়। ১০৮টি পদ্মফুল, ১০৮টি প্রদীপ দিয়ে দেবীকে প্রণাম জানানো হয়।

ত্রেতা যুগে এই সন্ধিপুজোর জন্য মহাবীর হনুমানকে 'দেবীদহ' থেকে ১০৮টি নীলপদ্ম তুলে আনতে বলেন রামচন্দ্র। মহাবজরংবলী তা নিয়েও আসেন। কিন্তু যথাবিহিত দেবীপূজার অকালবোধনের পরে সন্ধিপুজোর সময় রামচন্দ্র অর্ঘ্য দিতে গিয়ে দেখেন ১০৭টি নীলপদ্ম রয়েছে। যে হেতু তাঁর চক্ষুদু'টিকে নীলপদ্মাক্ষ বলা হয়, সে হেতু তখন তিনি দেবীর পূজা সম্পূর্ণ করার জন্য নিজের একটি চোখে তিরবিদ্ধ করে পুজো দিতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবী মা দুর্গা রামচন্দ্রের সামনে আবির্ভূতা হয়ে বললেন, তিনি রামচন্দ্রের ভক্তির পরীক্ষা করতে নিজেই একটি পদ্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন। অবশেষে দেবী প্রসন্না হলেন এবং রাবণকে বিনাশ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর প্রকাশিত রূপ দেখালেন।

সন্ধিপূজার সেই রীতি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজও প্রবহমান। দুর্গাপূজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল এই সন্ধিপুজা। এক পল মানে ২৪ সেকেন্ড, ৬০ পল মানে ২৪ মিনিট। সুতরাং আজকের সময়ের নিরিখে মহাষ্টমীর শেষ ২৪ মিনিট এবং মহানবমীর শুরুর ২৪ মিনিট, মোট ৪৮ মিনিট হল এই মহা সন্ধিপুজার সময়কাল।

স্মৃতিসাগর গ্রন্থে বলা হয়েছে–

"অষ্টম্যাঃ শেষো দণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব এব চ/অত্র য়া ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা।"

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আয়োজন করতে হয় সন্ধিপুজো। ঘড়ি ধরে টানা ৪৮ মিনিট ধরে এই পুজো আয়োজিত হয়। এই সনধি পুজোর সময় যাতে সেখানে কেউ কথা না বলেন, তার জন্য আবেদন করা হয়। একমাত্র মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে এই পুজো সম্পন্ন করে মাঝে বলিদান প্রথা সম্পন্ন করার রীতি বর্ণিত রয়েছে শাস্ত্রে। অষ্টমীর শেষ ২৪

মিনিট ও নবমীর শুরুর প্রথম ২৪ মিনিট ধরে এই পুজো সম্পন্ন হয়। এই সময় শুম্ভ নিশুম্ভকে দেবী বধ করেন বলে বর্ণিত রয়েছে। আর সেই কারণেই এই বিশেষ ক্ষণে সন্ধিপুজো সম্পন্ন হয়।

সন্ধি কথার অর্থ হল 'মিলন।' অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির শুরুর ২৪ মিনিট, মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হয় সন্ধিপুজো। এই দুই তিথির মহামিলনের সময়কে 'মহাসন্ধিক্ষণ' বলা হয়। এই পুজো করার অর্থ হল রাগ, অভিমান সব ভুলে একসঙ্গে থাকা।

এই পুজাতে মা এর চামুণ্ডা রূপের পুজো করা হয় শ্রী দুর্গা পুজোর অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে এই পুজা অনুষ্ঠিত হয় বলে এই পুজা কে সন্ধিপুজা বলা হয়। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট ধরে এই পুজা সম্পন্ন করা হয়। অষ্টমী তিথির ২৪ মিনিট শেষ হওয়া মাত্রই বলিদান করা হয়। এই পুজা তে ১০৮ টি ধানের ও ১০৮ টি চালের তৈরি ২ টি মালা ও রঙিন কাপড় দরকার হয়। দেবী পুরান মার্কন্ডেয় পুরান ও শ্রী শ্রী চন্ডী অনুসারে দেবী দুর্গা রক্তবীজ নামক অসুর কে বধ করার জন্য চামুণ্ডা রূপ ধারণ করেন। আর এই বলিদানের সময়ে অর্থাৎ অষ্টমী তিথি শেষ ও নবমী তিথির শুরুর মূহুর্তে দেবী রক্তবীজকে বধ করেন। দেবীর এই রূপই সবথেকে বেশি ভয়ংকর। দেবীর বীজমন্ত্রে এই ভয়ংকর রূপের বর্ননা দেওয়া হয়েছে। দেবীর এই রূপ সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাস ঘটায়। এই সন্ধিপুজার সময় মা এর কাছে ভক্তি ভরে প্রার্থনা করলে মা ভক্তের সব মনস্কামনা পুরন করেন।

মা দুর্গার সন্ধি পুজোয় ১০৮টি পদ্মফুল এবং ১০৮টি প্রদীপ উৎসর্গ করতে হয়। এই দু'টি ছাড়া মায়ের পুজো অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যদি বিধি মতে এই পুজো করা যায়, তা হলে নানা জীবনে রূপ ফল পাওয়া যায়। সকালে কুমারী পূজা, অঞ্জলি প্রদান ও রাতে সন্ধি পূজার মধ্যে দিয়ে মহাঅষ্টমী পূজা পালিত হয়। বিশ্বাস করা হয়, পৃথিবীতে সব নারীর মাঝেই বিরাজ করেন দেবী দূর্গা। আর সেই দেবীকে সম্মান জানাতেই অষ্টমীতে আয়োজন করা হয় কুমারী পূজার।

সন্ধিপূজায় চামুণ্ডার ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা পুর্ব্বক পুনধ্যান আবাহন আদি করে ষোড়শোপচাবে পূজা করা হয়। চামুণ্ডীর ধ্যান।–

"ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী। বিচিত্রখট্রাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণ॥
দ্বীপচর্ম্মপরাধান শুষ্কমাংসাতিভৈরব।
অতিবিস্তারবদন জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়ন নাদাপুরিভদিঘুখ।"

"ওঁ হ্রীং শ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে পুজা করা হয়। পরে চতুঃষষ্টিযোগিনীর পুজা করা হয়। তারপর যথাসময়ে বলি হয়। কোন কোন দেশে এই সময়ে অষ্টোত্তরশতঘৃতপ্রদীপ ও রচনাদি উৎসর্গ করা হয়। পরে স্তব পাঠান্তে যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমপণ করে ।

পূজা সমর্পণ মন্ত্র –মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করে।

"ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং তক্তিহীনং সুরেশ্বরি ।
যৎ পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্থ মে ।

উগ্রহীতুং শীর্ব্বদং পুজাং মর্ত্যমণ্ডলসংস্থিতাম।
চণ্ডিকে স্বাং নমাম্যন্ত স্বয়মধ্যং।

মূর্তির কথা: বাংলায় দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি সচরাচর দেখা যায় সেটি পরিবারসমন্বিতা বা সপরিবার দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তির মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী অথবা মহিষাসুরমর্দিনী; তাঁর মুকুটের উপরে শিবের ছোট মুখ, দেবীর ডানপাশে উপরে থাকেন লক্ষ্মী ও নিচে গণেশ; বামপাশে উপরে দেবী সরস্বতী ও নিচে কার্তিক। কলকাতায় সাবর্ণ রায়চৌধুরি পরিবার প্রথম ১৬১০ সালে এই সপরিবার দুর্গার প্রচলন করেন। তাঁরা কার্তিকের রূপ দেন জমিদারপুত্রের, যা তৎপূর্বে ছিল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আদলে যুদ্ধের দেবতা রূপে। কলকাতার কোনও কোনও বাড়িতে দুর্গোৎসবে লক্ষ্মী ও গণেশকে সরস্বতী ও কার্তিকের সঙ্গে স্থান বিনিময় করতে দেখা যায়। আবার কোথাও কোথাও দুর্গাকে শিবের কোলে বসে থাকতেও দেখা যায়।

কাঠামো তৈরি: ফি বছর রথযাত্রার দিন থেকে দুর্গা ঠাকুরের কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রথম খড় বাঁধা হয় ওইদিনেই। মণ্ডপের দুর্গাঠাকুরের সামনে তো দিব্যি ঝলমলে জরির কাজ। সলমা, চুমকি। কিন্তু পিছনে গেলে দেখা যাবে বাঁশ আর কাঠের উপর দাঁড় করানো দেবীমূর্তি। এই বাঁশ আর কাঠের কাঠামো তৈরি করা হয় রথযাত্রার দিনেই। এইদিন যোগমায়াদেবীর আবির্ভাব দিবস। সে কারণেই এই দিনটিকে শুভ বলে মনে করেন কারিগররাও। তাই এই বিশেষ দিন থেকেই শুরু হয় পুজোর প্রথম সলতে পাকানোর কাজ।

মাটির দেবতা: মা দুর্গার হাত আর মুখ তৈরি হয় বেলে আর এঁটেল মাটি মিশিয়ে। অনেক কাল আগে হুগলি থেকেই সেই মাটি আসত। বর্তমানে উলুবেড়িয়া থেকে আসে ওই মাটি। প্রথমে নিচের কাঠের তক্তা দিয়ে কাজ শুরু হয়। তারপরের অংশটিকে বলে ‘খিলোন’ করা। এই অংশে বাঁশ আর খড় দিয়ে কাঠামোর রূপ দেওয়া হয়। তারপর তার উপর দেওয়া হয় মাটির প্রলেপ। এই মাটির সঙ্গে মেশানো থাকে ধানের তুষ।

মাটির তৈরি মূর্তি বানাতে মূলত গঙ্গা মাটি, গো-চনা, গো-মূত্র এই তিন মূল উপাদানের প্রয়োজন হয় এবং এই উপাদান ছাড়া দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরী হয় না। আর এই তিন উপাদান ছাড়াও রয়েছে আরেক উপকরণ, যা দিয়ে দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরি হয়, তা হল গণিকালয়ের পুণ্য মাটি। এই উপাদান ব্যবহার করে পটুয়ারা দেবী দুর্গার প্রতিমা গড়েন। সমাজে এরা যতই তুচ্ছ হোক না কেন, মায়ের কাছে তাঁর সকল সন্তানই সমান। গণিকালয়ের পুণ্য মাটি ছাড়া তাই অসম্পূর্ণ থেকে যায় মায়ের মাটির মূর্তি।

শোনা যায় পতিতা পল্লির মাটি দিয়েই প্রথম প্রতিমা তৈরি শুরু হয়। কিন্তু অনেকেই জানেননা শুধু পতিতা পল্লির মাটি নয় দুর্গা প্রতিমার মাটিতে লাগে আরও অনেক উপকরণ। গাভীর মূত্র, গোবর, ধানের শীষ, পবিত্র গঙ্গার জল মেশানো হয় সেই মাটিতে। তাই দিয়েই তৈরি হয় দেবী মূর্তি। পতিতা পল্লির মাটিই কেন লাগে তার ব্যাখ্যা আছে অনেক, যাঁদের সমাজে একঘরে করে রাখা হয়, যাঁদের মনে করা হয় অশুচি, তাঁরাও যে নারী, সেকথা মনে করিয়ে দেয় এই নিয়ম।

পতিতালয়ে যখন কোনও পুরুষ যান তখন তিনি জীবনে সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য সেখানেই ফেলে আসেন। আর সংগ্রহ করেন পাপ। সমাজকে শুদ্ধ করে এই পতিতা পল্লিই। সেকারণে পতিতা পল্লির মাটি সবচেয়ে পবিত্র। সেই মাটি দিয়েই তৈরি হয় দেবী মূর্তি।

অনেকের মতেই গঙ্গা মাটি, গো-চনা এবং গো-মূত্র মানব দেহকে পবিত্র করে। তাই সমস্ত শুভ কাজের আগে এই তিন উপকরণের ব্যবহার করেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। আর সেই সূত্র ধরেই দুর্গা দেবীর আরাধনাতেও ব্যবহৃত হয় গঙ্গা মাটি, গো-চনা এবং গো-মূত্র।

গঙ্গা মাটি এবং গণিকালয়ের মাটির ছাড়াও দেবীর মূর্তি তৈরির কাজে যে মাটি ব্যবহৃত হয়, তাতে রাজদরবারের মাটি, চৌমাথার মাটি, গজদন্ত মৃত্তিকা, নদীর দুই তীরের মাটি থাকে। নারীশক্তিকে সম্মান জানিয়ে দুর্গা পুজোয় ব্যবহৃত হয় নবকন্যার ঘরের মাটি। এবং এই নবকন্যা হলেন (১) নর্তকী/ অভিনেত্রী, (২) কাপালিক, (৩) ধোপানী, (৪) নাপিতানি, (৫) ব্রাহ্মণী, (৬) শূদ্রাণী, (৭) গোয়ালিনী, (৮) মালিনী ও (৯) পতিতা।

কথিত আছে নবরাত্রির নবম রূপটিই আসলে পতিতালয়ের প্রতিনিধি বা ব্রাত্য রূপ, নবম রূপটি কিন্তু সিদ্ধিদাত্রী রূপ, সর্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী মায়ের এই রূপ। মনে করা হয়, সে কারণেও এই রীতি পালন করা হয়ে থাকে। পতিতা পল্লির মাটির দিয়ে মূর্তি তৈরির রীতিটি সেখান থেকে এসেছে বলেও শোনা যায়৷

নবরাত্রিতে দেবীর নটি রূপের আরাধনা করা হয়ে থাকে। মহাষ্টমীতেই দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। যেই সময়ে মহিষাসুরকে বধকরা হয় তাকে বলা হয় সন্ধিক্ষণ। পুরানে বর্ণিত হয়েছে একটি বিশেষ মুহূর্তেই কেবল মাত্র মহিষাসুরকে বধকরা যেত। সেটা না দিন না রাত্রি অর্থাৎ দুই সময়ের সন্ধিক্ষণ। কোনও পুরুষ তাঁকে বধ করতে পারতেন না বলেই মহামায়াকে পাঠানো হয়েছিল মহিষাসুর বধ করতে। সন্ধিক্ষণে যে রূপটিতে মায়ের আরাধনা সেটি চামুন্ডারূপ, উগ্রা মূর্তি। প্রচলিত বিশ্বাস এই সময়ে মৃন্ময়ী দেবী চিন্ময়ীরূপে বিরাজ করেন এবং ভক্তের সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন তিনি।

কীভাবে তৈরি হয় ঠাকুর: তুষ মেশানো এই মাটির প্রলেপকে কুমোরটুলির ভাষায় বলে ‘একমেটে।’ ‘একমেটে’-র পর গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে তৈরি হয় পরের প্রলেপ। এই প্রলেপকে বলে ‘দোমেটে।’ ‘দোমেটে’ করার আগেই বানিয়ে নেওয়া হয় প্রতিমার মুখ। এরপর রোদে শুকোনো হয় মূর্তি। একে একে আলাদা করে বানানো হয় প্রতিমার হাতের ও পায়ের পাতা। সেগুলো লাগিয়ে দেওয়া হয় মূর্তির সঙ্গে। তারপর সুতির কাপড় কাদাতে ভিজিয়ে শুকিয়ে আসা মৃন্ময়ী প্রতিমার ফাটলগুলো সারিয়ে ফেলা হয়। এরপর তার উপর খড়ি দিয়ে সাদা রং করা হয়। সবশেষে করা হয় প্রতিমার রং। আর তার পরেই আঁকা হয় মায়ের চোখ। তবে যত সহজে লিখে ফেলা গেল কাজটি মোটেই তত সহজ নয়।

চালচিত্র হল সাবেকি দুর্গা প্রতিমার উপরিভাগে অঙ্কিত দেবদেবীর কাহিনিমূলক পটচিত্র, যা প্রধানত অর্ধগোলাকৃতি হয়। চালচিত্রে পঞ্চানন শিব, মহিষাসুর বধ, নন্দীভৃঙ্গী, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ প্রভৃতি কাহিনি চিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত থাকে। এই চিত্রকলার একটি নিজস্ব রূপরেখা ও শৈলীগত দৃঢ় বুনিয়াদ রয়েছে। চালচিত্র শব্দের ‘‘চাল’’ শব্দের অর্থ আচ্ছাদন। প্রতিমার চালির উপরে আঁকা হয় বলে এর নাম চালচিত্র। চালচিত্রের মূল বিষয়বস্তু হল শিবদুর্গা, কৈলাস, শিব অনুচর নন্দীভৃঙ্গী, মহিষাসুর বধ, দশাবতার ইত্যাদি। চালচিত্র তৈরির কিছু নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিমার চালির উপরিভাগে অর্ধগোলাকৃতি বাঁশের খাঁচা করে তার উপর কাদালেপা এক প্রস্থ মোটা কাপড় টানটান করে লাগিয়ে কাপড়ের বাড়তি অংশ বাঁশের খাঁচার পিছন দিকে মুড়ে দেওয়া হয়। কাদালেপা কাপড়টি শুকিয়ে গেলে তার উপর খড়ি গোলার কয়েকটি আস্তরণ দেওয়া হয়। এর উপর পরিকল্পিত কাহিনিমূলক চিত্র আঁকা হয়।

দুর্গার লালচে বরণ কেন?

পুরাণ মতে মা দুর্গার পরনের শাড়ি লালচে অগ্নি বর্ণের। রাগ, শক্তি আর জয়ের প্রতীক এই শাড়ি। সমাজের সমস্ত পাপ খণ্ডন করে শুভ শক্তির জয়জয়কার ঘোষণা করে শাড়ির এই রং॥

কেন দেবী'র দশটা হাত?

কোনও মহিলা যখন একসঙ্গে হাজারও কাজ সামলান তাঁর সঙ্গে আমরা দুর্গার তুলনা টেনেই বলি 'দশভুজা।' কোনও দেবতারই যে দুর্গার মতো অত হাত নেই। স্রেফ অতগুলো হাতে অস্ত্র ধরার জন্য নয়, দুর্গার দশ হাত দশ দিক রক্ষা করারও প্রতীক। দশ দিক হল পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত, ঊর্ধ্ব এবং অধঃ। এই দশ প্রহরণ নিয়েই তিনি প্রতি আক্রমণ করেছেন মহিষাসুরকে। অনেকে বলেন মানবজাতির সকল অশুভ বিনাশ করার জন্যই তিনি দশপ্রহরণ ধারিণী।

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী ।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী॥

(বিঃ দ্রঃ–সংস্কৃতে "য"-এর উচ্চারণ "য়" হয়)

{শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ধ্যান, শ্লোক–৩}

[যে চণ্ডিকা মধুকৈটভাদি-দৈত্যনাশিনী, যিনি মহিষাসুরমর্দিনী, যিনি ধূম্রলোচন-চণ্ড-মুণ্ড-সংহারিণী, যিনি রক্তবীজ-ভক্ষয়ত্রী, যে মহাশক্তি শুম্ভ-নিশুম্ভ-অসুর-বিনশিনী ও শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী এবং নবকোটী-সহচরী-পরিবৃতা, সেই জগদীশ্বরী দেবী আমাকে পালন করুন।]

জয় মা দুর্গা

দুর্গামূর্তি....বেহালার সাহাবাড়ি আর নবদ্বারিক

BANGLADARSHAN.COM

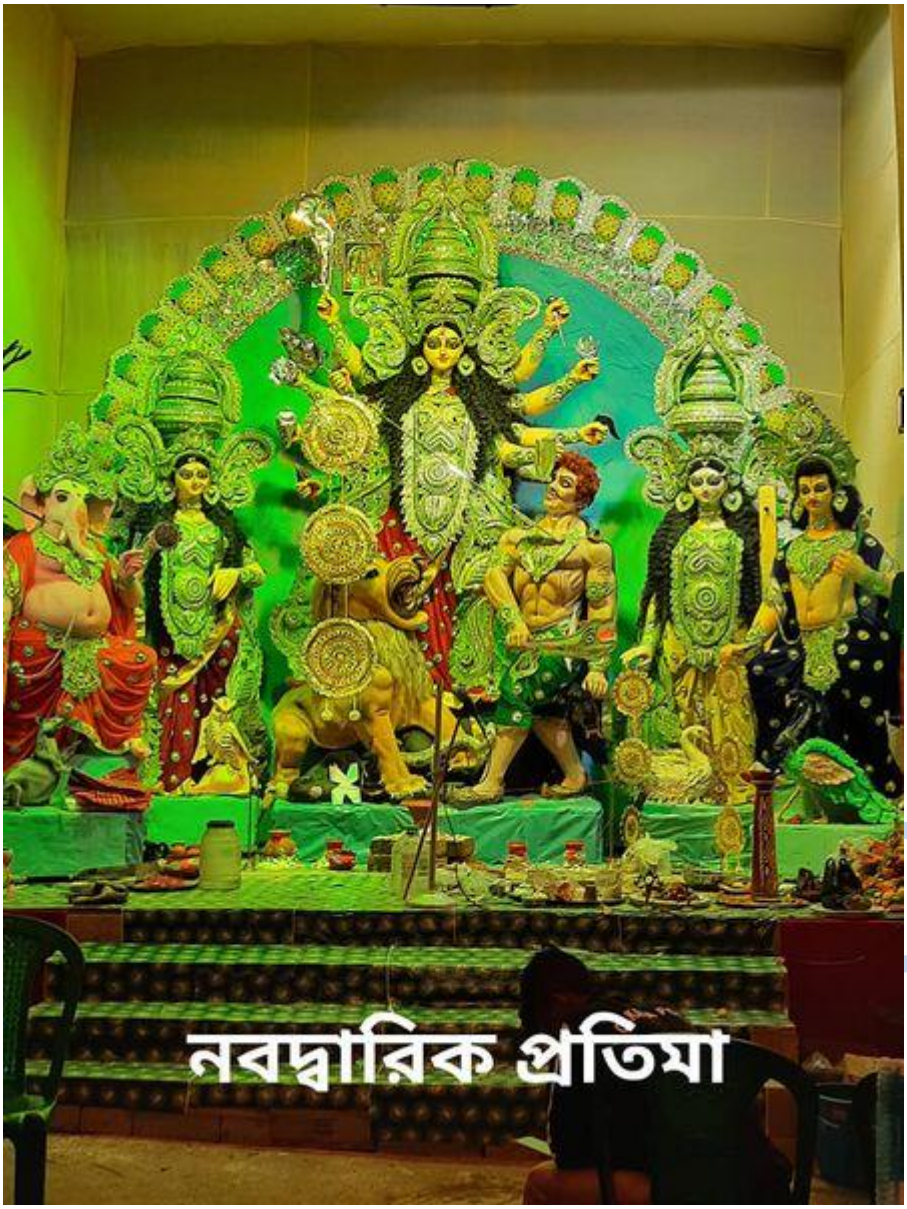

BAN COM

॥দুর্গাতত্ত্ব–৪॥

পঞ্চদেবতার নবমী দশমী অপরাজিতা পূজা:-

****

যে কোন পূজার আগে পঞ্চ দেবতার পূজা করতে হয়। এই পূজা পদ্ধতি প্রণয়ন করেন আদি শঙ্করাচার্য। যে সময় হিন্দুধর্ম নানাভাবে পিছিয়ে পড়েছিল, আদি শঙ্করাচার্য সেই পিছিয়ে পড়া হিন্দুধর্মকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

তাঁর প্রচারকার্যের ফলে ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের প্রভাব কমতে শুরু করে। মাত্র বত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর হিন্দুধর্ম সংস্কারের কথা আজও লোকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে। তিনি হারিয়ে যাওয়া বেদান্ত উদ্ধার করেন এবং সে সকলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করেন।

যার ফলে ভারতে বৌদ্ধ দর্শনের বিলোপ ঘটে এবং আবার জেগে উঠে হিন্দু তথা সনাতন বৈদিক দর্শন।
তাঁর আরেকটি বড় অবদান পঞ্চ দেবতার পূজা বিধান করা। যার ফলে হিন্দু সমাজে বিভিন্ন মতবাদের ঐক্য সাধন হয়। সম্ভবত কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক পৃথিবীর ইতিহাসে হিন্দু সভ্যতার সব থেকে বড় বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে তাঁর হাত ধরে। এরপর ঠিক একই রকম ভাবে স্বামী বিবেকানন্দ জাগিয়ে তুলেছিলেন হিন্দু দর্শনকে সারা পৃথিবীতে। যাঁরা দীক্ষিত তাঁরা শুরু করেন গুরুবন্দনা দিয়ে।

গুরু বন্দনা

ওঁ অখন্ড-মন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥১
ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥২
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥৩
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥৪
ব্রহ্মানন্দং পরম-সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি-লক্ষ্যম্॥৫
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণ-রহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥৬
মন্ত্রঃ সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবো নিরঞ্জনঃ।

গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদম্॥৭
পিতৃমাতৃ-সুহৃদ্বন্ধু-বিদ্যা-তীর্থানি দেবতা।
ন তুল্যং গুরুণা শীঘ্রং স্পর্শয়েৎ পরমং পদম্॥৮
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥৯

গণেশের ধ্যান:-

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দম্মদগন্ধলুব্ধ মধুপব্যালোলগন্ডস্থলম্।
দন্তাঘাত বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং , বন্দেশৈল সুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥

মন্ত্র–ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।

গণেশের প্রণাম:-

ওঁ দেবেন্দ্র- মৌলি- মন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ॥

শিবের ধ্যান:-

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতসং রত্নাকল্পোজ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাত্ স্তুতমমরগণৈ র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

মন্ত্র–ওঁ নমঃ শিবায়।

শিবের প্রনাম মন্ত্র:-

ওঁ নমস্তভ্যঃ বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুসে নমঃ।
পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নমত্রিশূলহস্তায় দন্ড পাশাংসিপাণয়ে।
নমঃ ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
ওঁ বানেশ্বরায় নরকার্ণবতারনায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।

কর্পূরকুন্ডবলেন্দুজটাধরায়, দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ানি চাত্মানংত্বংগতিপরমেশ্বরঃ॥

জয়দুর্গার ধ্যান:-

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলীবন্ধেন্দুরেখাম্।
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহাস্কন্ধাধিরুঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পুরয়ন্তীম্।
ধ্যায়েদ্ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

মন্ত্র–ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।

প্রনাম মন্ত্র:-

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বাথসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি! নমোহস্তুতে॥

বিষ্ণুর ধ্যান:-

ওঁ উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী-সংশোভিপার্শ্বদ্বয়ম্।
কোটিরাঙ্গদহারকুন্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভোদ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসচ্ছ্রীবৎসচিহ্নং ভজে ॥

মন্ত্র–ওঁ নমো বিষ্ণবে।

ভগবান বিষ্ণুর প্রণাম:

ওঁ নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ্যহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
পাপোহহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুন্ডরীকাক্ষং সর্বপাপহরো হরি॥

সূর্য এর ধ্যান:-

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

মন্ত্র–হ্রাং হ্রীং সঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়।

সূর্যের প্রণাম:-

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম।
ধান্তারীং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥

এখানে পঞ্চ দেবতার পূজার মন্ত্র দিলাম সকলের অবগতির জন্য। যে কোন পূজার আগে এই পঞ্চদেবতার পূজা করতে হয়।

নবমী:-

নবমী মানেই সকলের মুখ ভার। কারণ, মাত্র কয়েক ঘন্টা পর ঘরের মেয়ে উমা বাপের বাড়ি ছেড়ে পুনরায় ফিরে যাবেন কৈলাসে। কিন্তু আর কি করার আছে, কালের নিয়মে আমাদের বিদায় জানাতে হবে মা দুর্গাকে। তাই মা বিদায় নেওয়ার আগে আপামর বাঙালির কাছে দুর্গাপূজার নবমীর দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাৎপর্য

মহানবমী পুজোর তাৎপর্য সম্পর্কে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। তবে হিন্দু পুরাণ মতে মা দুর্গা মহিষাসুরকে দশমীতে বধ করছিলেন, তাই সেই দিক থেকে দেখতে গেলে যুদ্ধের শেষ দিন নবমী। অষ্টমী আর নবমীর সন্ধিক্ষণের সন্ধি পুজোর সময় মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। শাস্ত্র মতে, এই দিন দেবীর পূর্ণাঙ্গ পুজো করা হয়।

পূজা বিধি

অষ্টমীর পূজার্চনার মতোই নবমীর দিনও জাঁকজমক সহকারে মায়ের কাছে পুজো করা হয়। শাস্ত্র মতে, নবমীর দিন মায়ের পূর্ণাঙ্গ পুজো হয় বলে, এই তিথিতে বলি, হোম এবং ষোড়শ উপাচারের বিধান রয়েছে। এই বলিদান মহা নবমীর একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি। মূলত মা দুর্গাকে সন্তুষ্ট করতে এবং তাঁর আশীর্বাদ পেতে করা হয়। অনেকেই ভাবেন বলি সাধারণত অষ্টমীতেই হয়। কিন্তু না, বলিদানের রীতিটি কেবল নবমীতেই সঞ্চালিত হয়। শাস্ত্র মতে, সন্ধি পুজোর প্রথম দণ্ড অর্থাৎ ২৪ মিনিট পার হওয়ার পরেই হয় বলি। সহজ করে বলতে গেলে, নবমী তিথি শুরু হওয়ার প্রথম ২৪ মিনিটের মধ্যে হয়।

প্রাচীন যুগে এই দিনে মায়ের কাছে পশু বলি হলেও, বর্তমান দিনে পশু বলি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই এখন কুমড়ো, লাউ, আখ, শসা বা কলা ইত্যাদি বলিতে ব্যবহার করা হয়।

কোথাও কোথাও এই দিনে কুমারী পুজোও হয়ে থাকে। হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান কুমারী পুজো দেখার জন্য। ঘরের মায়েরা পরিবারের মঙ্গল কামনায় উপোস থেকে অঞ্জলি দিয়ে থাকেন। এই দিন বহু মণ্ডপে চলে

পঙক্তি ভোজন। পুজো উদ্যোক্তারা লুচি, খিচুড়ি ও ফল, প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করেন সকলের মধ্যে। নবমীর সর্বশেষ আকর্ষণ হল সন্ধ্যা আরতি ও ধুনুচি নাচ।

দশমী:-

দশমী মানেই সর্বত্র বিদায়ের সুর। উমা সেদিন কৈলাস রওনা দেন। পুরাণে কথিত আছে, মহিষাসুরের সঙ্গে ৯ দিন ও ৯ রাত্রি যুদ্ধ করার পর দশম দিনে জয় লাভ করেন দেবী দুর্গা। সেই জয়কেই চিহ্নিত করে বিজয়া দশমী। এই দিনটিতে অসুর নিধনের পর অসুরের রক্ত দিয়ে দেবতারা বিজয় উৎসব পালন করে ছিলেন। সেই লোকাচার বাংলার ঘরে ঘরে সিঁদুর খেলা হিসেবে পরিণত হয়েছে।

তবে উত্তর ও মধ্য ভারতে এই দিনে যে দশেরা উদযাপিত হয়, তার তাৎপর্য ভিন্ন। বাল্মীকি রচিত রামায়ণে কথিত আছে, আশ্বিন মাসের শুক্লা পক্ষের দশমী তিথিতেই নাকি রাবনকে বধ করেছিলেন শ্রী রামচন্দ্র। তাই এই দিনটিকে দশেরা বা দশহরা হিসেবে পালন করেন উত্তর ও মধ্য ভারতের মানুষ।

আবার কালিদাসের রঘুবংশ ও তুলসিদাসের রামচরিতমানসে বলা হয়েছে যে আশ্বিনের তিরিশতম দিনে লঙ্কা জয় করে সস্ত্রীক অযোধ্যায় ফিরেছিলেন শ্রী রামচন্দ্র। সেই প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঘরে ঘরে জ্বলেছিল দীপ। সেই রীতিই দশেরা ও দীপাবলি রূপে পালন করা হয়।

অপরাজিতা দেবীর পুজো:-

কিন্তু এদিনেই দুর্গার আরও এক রূপে পূজিত হন দেবী দুর্গা। বিসর্জনের পর হয় বোধন। শারদীয়ার পর পুজিত হন দেবী অপরাজিতা। ‘অপরাজিতা’ দেবী দুর্গারই অন্য রূপ।

বিজয়লাভের সঙ্কল্প নিয়ে হয় অপরাজিতা পুজো। শোনা যায়, আগেকার দিনে নবরাত্রির পর রাজারা যুদ্ধযাত্রা করতেন। দিনটা হত বিজয়া দশমী। যুদ্ধের জন্য এই সময়টাকেই বেছে নিতেন রাজারা। তার অবশ্য কিছু কারণ ছিল। প্রথমত, চাণক্য বা কৌটিল্য তাঁর ‘অর্থশাস্ত্র’ অনুযায়ী এই সময়টাই যুদ্ধযাত্রার শ্রেষ্ঠ সময়। পণ্ডিত রঘুনন্দন তাঁর ‘তিথিতত্ত্ব’ গ্রন্থেও একই কথা বলেছে। সেখানে বলা হয়েছে, রাজা যদি দশমীর পর যাত্রার সূচনা করেন, তাহলে তার জয় হয় না। তাই যুদ্ধে অপরাজেয় থাকতে এদিন যাত্রা করতেন রাজারা। আর বিজয়লক্ষীকে বরণের প্রত্যাশা নিয়েই করা হত অপরাজিতা পুজো। যে ধারা আজও বর্তমান।

কীভাবে হয় এই পুজো?

পুরাণ মতে, অপরাজিতা আরাধনা দুর্গাপুজোরই অন্য অঙ্গ। কারণ, উমা তথা দুর্গার অন্য নামই নাকি অপরাজিতা। তবে এই দেবীর মূর্তি অন্যরকম। অপরাজিতা চতুর্ভূজা। হাতে শঙ্খ, চক্র, বর ও অভয়মুদ্রা শোভিত, ত্রিনয়না ও মাথায় চন্দ্রকলা সম্বলিত এই দেবী নীল বর্ণা বলে পুরাণে কথিত। দেবী দুর্গার বিসর্জনের পর পুজো মণ্ডপের ইশান কোণে অষ্টদল পদ্ম এঁকে অপরাজিতা লতা রেখে পুজো করা হয়।

সাদা অপরাজিতা গাছকে এদিন পুজো করা হয়। গাছটিকে দেবীরূপে কল্পনা করে পুজো করা হয় ফুল, বেলপাতা দিয়ে। অনেকে আবার ঘটস্থাপন করেও পুজো করেন। পুজোর ফল লাভের জন্য হাতে অপরাজিতা

লতা বাঁধার রীতিও রয়েছে। এদিন দেবীর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়, দেবীর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়, ‘‘হে অপরাজিতা দেবি, তুমি সর্বদা আমার বিজয় বর্ধন কর। আমার মঙ্গল ও বিজয় লাভের জন্য আমি দক্ষিণ হাতে তোমাকে ধারণ করছি। তুমি শত্রু নাশ করে নানা সমৃদ্ধির সহিত আমাকে বিজয় দান কর। রামচন্দ্র যেমন রাবণের উপর বিজয় লাভ করেছিলেন, আমারও যেন সেইরূপ জয় লাভ হয়।’’ অপরাজিতা স্তোত্র পাঠে হয় এই পুজো, তারপর দুর্গাপদুদ্ধারস্তব দিয়ে স্তুতি করা হয় মায়ের কাছে।

অপরাজিতাস্তোত্র:-

ওঁ নমোঽপরাজিতায়ৈ ।
ওঁ অস্যা বৈষ্ণব্যাঃ পরায়া অজিতায়া মহাবিদ্যায়াঃ
বামদেব-বৃহস্পতি-মার্কেণ্ডেয়া ঋষয়ঃ।
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহতী ছন্দাংসি।
লক্ষ্মীনৃসিংহো দেবতা।
ওঁ ক্লীং শ্রীং হ্রীং বীজম্।
হুং শক্তিঃ।
সকলকামনাসিদ্ধ্যর্থং অপরাজিতবিদ্যামন্ত্রপাঠে বিনিয়োগঃ।
ওঁ নিলোৎপলদলশ্যামাং ভুজঙ্গাভরণান্বিতাম্ ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং চন্দ্রকোটিনিভাননাম্॥১॥
শঙ্খচক্রধরাং দেবী বৈষ্ণীমপরাজিতাম্
বালেন্দুশেখরাং দেবীং বরদাভয়দায়িনীম্॥২॥
নমস্কৃত্য পপাঠৈনাং মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ॥৩॥

BANGL

মার্কণ্ডেয় উবাচ–

শৃণুষ্বং মুনয়ঃ সর্বে সর্বকামার্থসিদ্ধিদাম্।
অসিদ্ধসাধনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্॥৪॥
ওঁ নমো নারায়ণায়, নমো ভগবতে বাসুদেবায়,
নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রশীর্ষায়ণে, ক্ষীরোদার্ণবশায়িনে,
শেষভোগপর্য্যঙ্কায়, গরুডবাহনায়, অমোঘায়
অজায় অজিতায় পীতবাসসে,
ওঁ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,
হয়গ্রিব, মৎস্য কূর্ম্ম, বারাহ নৃসিংহ, অচ্যুত,
বামন, ত্রিবিক্রম, শ্রীধর রাম রাম রাম ।
বরদ, বরদ, বরদো ভব, নমোঽস্তু তে, নমোঽস্তুতে, স্বাহা,
ওঁ অসুর-দৈত্য-য়ক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচ-কূষ্মাণ্ড-
সিদ্ধ-য়োগিনী-ডাকিনী-শাকিনী-স্কন্দগ্রহান্

উপগ্রহান্নক্ষত্রগ্রহাংশ্চান্যা হন হন পচ পচ
মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয়
চূর্ণয় চূর্ণয় শঙ্খেন চক্রেণ বজ্রেণ শূলেন
গদয়া মুসলেন হলেন ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা।
ওঁ সহস্রবাহো সহস্রপ্রহরণায়ুধ,
জয় জয়, বিজয় বিজয়, অজিত, অমিত,
অপরাজিত, অপ্রতিহত, সহস্রনেত্র,
জ্বল জ্বল, প্রজ্বল প্রজ্বল,
বিশ্বরূপ বহুরূপ, মধুসূদন, মহাবরাহ,
মহাপুরুষ, বৈকুণ্ঠ, নারায়ণ,
পদ্মনাভ, গোবিন্দ, দামোদর, হৃষীকেশ,
কেশব, সর্বাসুরোৎসাদন, সর্বভূতবশঙ্কর,
সর্বদুঃস্বপ্নপ্রভেদন, সর্বয়ন্ত্রপ্রভঞ্জন,
সর্বনাগবিমর্দন, সর্বদেবমহেশ্বর,
সর্ববন্ধবিমোক্ষণ,সর্বাহিতপ্রমর্দন,
সর্বজ্বরপ্রণাশন, সর্বগ্রহনিবারণ,
সর্বপাপপ্রশমন, জনার্দন, নমোঽস্তুতে স্বাহা।
বিষ্ণোরিয়মনুপ্রোক্তা সর্বকামফলপ্রদা।
সর্বসৌভাগ্যজননী সর্বভীতিবিনাশিনী॥৫॥
সর্বৈংশ্চ পঠিতাং সিদ্ধৈর্বিষ্ণোঃ পরমবল্লভা।
নানয়া সদৃশং কিঞ্চিদ্দুষ্টানাং নাশনং পরম্॥৬॥
বিদ্যা রহস্যা কথিতা বৈষ্ণব্যেষাপরাজিতা।
পঠনীয়া প্রশস্তা বা সাক্ষাৎসত্ত্বগুণাশ্রয়া॥৭॥
ওঁ শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎসর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥৮॥
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি হ্যভয়ামপরাজিতাম্।
য়া শক্তির্মামকী বৎস রজোগুণময়ী মতা॥ ৯॥
সর্বসত্ত্বময়ী সাক্ষাৎসর্বমন্ত্রময়ী চ য়া।
য়া স্মৃতা পূজিতা জপ্তা ন্যস্তা কর্মণি য়োজিতা।
সর্বকামদুধা বৎস শৃণুষ্বৈতাং ব্রবীমি তে॥১০॥
য় ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীমপ্রতিহতাং
পঠতি সিদ্ধাং স্মরতি সিদ্ধাং মহাবিদ্যাং
জপতি পঠতি শৃণোতি স্মরতি ধারয়তি কীর্তয়তি বা
ন তস্যাগ্নিবায়ুবজ্রোপলাশনিবর্ষভয়ং,

BANGL

ন সমুদ্রভয়ং, ন গ্রহভয়ং, ন চৌরভয়ং,
ন শত্রুভয়ং, ন শাপভয়ং বা ভবেত্ ।
ক্বচিদ্রাত্র্যন্ধকারস্ত্রীরাজকুলবিদ্বেষি-বিষগরগরদবশীকরণ–
বিদ্বেষোচ্চাটনবধবন্ধনভয়ং বা ন ভবেত্।
এতৈর্মন্ত্রৈরুদাহৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ।
ওঁ নমোঽস্তুতে।
অভয়ে, অনঘে, অজিতে, অমিতে, অমৃতে, অপরে,
অপরাজিতে, পঠতি, সিদ্ধে জয়তি সিদ্ধে,
স্মরতি সিদ্ধে, একোনাশীতিতমে, একাকিনি, নিশ্চেতসি,
সুদ্রুমে, সুগন্ধে, একান্নশে, উমে ধ্রুবে, অরুন্ধতি,
গায়ত্রি, সাবিত্রি, জাতবেদসি, মানস্তোকে, সরস্বতি,
ধরণি, ধারণি, সৌদামনি, অদিতি, দিতি, বিনতে,
গৌরি, গান্ধারি, মাতঙ্গী কৃষ্ণে, য়শোদে, সত্যবাদিনি,
ব্রহ্মবাদিনি, কালি, কপালিনি, করালনেত্রে, ভদ্রে, নিদ্রে,
সত্যোপয়াচনকরি, স্থলগতং জলগতং অন্তরিক্ষগতং
বা মাং রক্ষ সর্বোপদ্রবেভ্যঃ স্বাহা।
য়স্যাঃ প্রণশ্যতে পুষ্পং গর্ভো বা পততে য়দি।
ম্রিয়তে বালকো য়স্যাঃ কাকবন্ধ্যা চ য়া ভবেত্॥১১॥
ধারয়েদ্যা ইমাং বিদ্যামেতৈর্দোষৈর্ন লিপ্যতে।
গর্ভিণী জীববৎসা স্যাৎপুত্রিণী স্যান্ন সংশয়ঃ॥১২॥
ভূর্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং লিখিত্বা গন্ধচন্দনৈঃ।
এতৈর্দোষৈর্ন লিপ্যেত সুভগা পুত্রিণী ভবেত্॥১৩॥
রণে রাজকুলে দ্যূতে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেত্।
শস্ত্রং বারয়তে হ্যেষা সমরে কাণ্ডদারুণে॥১৪॥
গুল্মশূলাক্ষিরোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশ্যতি চ ব্যথাম্॥
শিরোরোগজ্বরাণাং ন নাশিনী সর্বদেহিনাম্॥১৫॥
ইত্যেষা কথিতা বিধ্যা অভয়াখ্যাঽপরাজিতা।
এতস্যাঃ স্মৃতিমাত্রেণ ভয়ং ক্বাপি ন জায়তে॥১৬॥
নোপসর্গা ন রোগাশ্চ ন য়োধা নাপি তস্করাঃ।
ন রাজানো ন সর্পাশ্চ ন দ্বেষ্টারো ন শত্রবঃ॥১৭॥
য়ক্ষরাক্ষসবেতালা ন শাকিন্যো ন চ গ্রহাঃ।
অগ্নের্ভয়ং ন বাতাচ্ব ন স্মুদ্রান্ন বৈ বিষাত্॥১৮॥
কার্মণং বা শত্রুকৃতং বশীকরণমেব চ।
উচ্চাটনং স্তম্ভনং চ বিদ্বেষণমথাপি বা॥১৯॥

BANGL

ন কিঞ্চিৎপ্রভবেত্তত্র য়ত্রৈষা বর্ততেঽভয়া।
পঠেদ্ বা য়দি বা চিত্রে পুস্তকে বা মুখেঽথবা॥২০॥
হৃদি বা দ্বারদেশে বা বর্ততে হ্যভয়ঃ পুমান্।
হৃদয়ে বিন্যসেদেতাং ধ্যায়েদ্দেবীং চতুর্ভুজাম্॥২১॥
রক্তমাল্যাম্বরধরাং পদ্মরাগসমপ্রভাম্।
পাশাঙ্কুশাভয়বরৈরলঙ্কৃতসুবিগ্রহাম্॥২২॥
সাধকেভ্যঃ প্রয়চ্ছন্তীং মন্ত্রবর্ণামৃতান্যপি।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্বশীকরণমনুত্তমম্॥২৩॥
রক্ষণং পাবনং চাপি নাত্র কার্যা বিচারণা।
প্রাতঃ কুমারিকাঃ পূজ্যাঃ খাদ্যৈরাভরণৈরপি।
তদিদং বাচনীয়ং স্যাত্তৎপ্রীত্যা প্রীয়তে তু মাম্॥২৪॥
ওঁ অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি বিদ্যামপি মহাবলাম্।
সর্বদুষ্টপ্রশমনীং সর্বশত্রুক্ষয়ঙ্করীম্॥২৫॥
দারিদ্র্যদুঃখশমনীং দৌর্ভাগ্যব্যাধিনাশিনীম্।
ভূতপ্রেতপিশাচানাং য়ক্ষগন্ধর্বরক্ষসাম্॥২৬॥
ডাকিনী শাকিনী-স্কন্দ-কূষ্মাণ্ডানাং চ নাশিনীম্।
মহারৌদ্রিং মহাশক্তিং সদ্যঃ প্রত্যয়কারিণীম্॥২৭॥
গোপনীয়ং প্রয়ত্নেন সর্বস্বং পার্বতীপতেঃ।
তামহং তে প্রবক্ষ্যামি সাবধানমনাঃ শৃণু॥২৮॥
একাহ্নিকং দ্ব্যহ্নিকং চ চাতুর্থিকার্দ্ধমাসিকম্।
দ্বৈমাসিকং ত্রৈমাসিকং তথা চাতুর্মাসিকম্॥২৯॥
পাঞ্চমাসিকং ষাঙ্মাসিকং বাতিক পৈত্তিকজ্বরম্।
শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং তথৈব সততজ্বরম্॥৩০॥
মৌহূর্তিকং পৈত্তিকং শীতজ্বরং বিষমজ্বরম্।
দ্ব্যহ্নিকং ত্র্যহ্নিকং চৈব জ্বরমেকাহ্নিকং তথা।
ক্ষিপ্রং নাশয়েতে নিত্যং স্মরণাদপরাজিতা॥৩১॥
ওঁ হূং হন হন, কালি শর শর, গৌরি ধম্,
ধম্, বিদ্যে আলে তালে মালে গন্ধে বন্ধে পচ পচ
বিদ্যে নাশয় নাশয় পাপং হর হর সংহারয় বা
দুঃখস্বপ্নবিনাশিনি কমলস্তিথতে বিনায়কমাতঃ
রজনি সন্ধ্যে, দুন্দুভিনাদে, মানসবেগে, শঙ্খিনি,
চাক্রিণি গদিনি বজ্রিণি শূলিনি অপমৃত্যুবিনাশিনি
বিশ্বেশ্বরি দ্রবিডি দ্রাবিডি দ্রবিণি দ্রাবিণি
কেশবদয়িতে পশুপতিসহিতে দুন্দুভিদমনি দুর্ম্মদদমনি।

BANGL

শবরি কিরাতি মাতঙ্গি ওঁ দ্রং দ্রং জ্রং জ্রং ক্রং
ক্রং তুরু তুরু ওঁ দ্রং কুরু কুরু।
য়ে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তান্ সর্বান্
দম দম মর্দয় মর্দয় তাপয় তাপয় গোপয় গোপয়
পাতয় পাতয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয়
ব্রহ্মাণি বৈষ্ণবি মাহেশ্বরি কৌমারি বারাহি নারসিংহি
ঐন্দ্রি চামুন্ডে মহালক্ষ্মি বৈনায়িকি ঔপেন্দ্রি
আগ্নেয়ি চণ্ডি নৈর্ঋতি বায়ব্যে সৌম্যে ঐশানি
ঊর্ধ্বমধোরক্ষ প্রচণ্ডবিদ্যে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি।
ওঁ নমো দেবি জয়ে বিজয়ে শান্তি স্বস্তি-তুষ্টি পুষ্টি- বিবর্দ্ধিনি।
কামাঙ্কুশে কামদুধে সর্বকামবরপ্রদে।
সর্বভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা।
আকর্ষণি আবেশনি-, জ্বালামালিনি–, রমণি রামণি,
ধরণি ধারিণি, তপনি তাপিনি, মদনি মাদিনি, শোষণি সম্মোহিনি।
নীলপতাকে মহানীলে মহাগৌরি মহাশ্রিয়ে।
মহাচান্দ্রি মহাসৌরি মহামায়ূরি আদিত্যরশ্মি জাহ্নবি।
য়মঘণ্টে কিণি কিণি চিন্তামণি।
সুগন্ধে সুরভে সুরাসুরোৎপন্নে সর্বকামদুঘে।
য়দ্যথা মনীষিতং কার্যং তন্মম সিদ্ধ্যতু স্বাহা।
ওঁ স্বাহা।
ওঁ ভূঃ স্বাহা।
ওঁ ভুবঃ স্বাহা।
ওঁ স্বঃ স্বহা।
ওঁ মহঃ স্বহা।
ওঁ জনঃ স্বহা।
ওঁ তপঃ স্বাহা।
ওঁ সত্যং স্বাহা।
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।
য়ত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহেত্যোম্।
অমোঘৈষা মহাবিদ্যা বৈষ্ণবী চাপরাজিতা॥৩২॥
স্বয়ং বিষ্ণুপ্রণীতা চ সিদ্ধেয়ং পাঠতঃ সদা।
এষা মহাবলা নাম কথিতা তেঽপরাজিতা॥৩৩॥
নানয়া সদ্রশী রক্ষা। ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
তমোগুণময়ী সাক্ষদ্রৌদ্রী শক্তিরিয়ং মতা॥৩৪॥

BANGL

কৃতান্তোঽপি য়তো ভীতঃ পাদমূলে ব্যবস্থিতঃ।
মূলধারে ন্যসেদেতাং রাত্রাবেনং চ সংস্মরেত্॥৩৫॥
নীলজীমূতসঙ্কাশাং তড়িৎকপিলকেশিকাম্।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং নেত্রত্রয়বিরাজিতাম্॥৩৬॥
শক্তিং ত্রিশূলং শঙ্খং চ পানপাত্রং চ বিভ্রতীম্।
ব্যাঘ্রচর্মপরীধানাং কিঙ্কিণীজালমণ্ডিতাম্॥৩৭॥
ধাবন্তীং গগনস্যান্তঃ তাদুকাহিতপাদকাম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনাং ব্যালকুণ্ডলভূষিতাম্॥৩৮॥
ব্যাত্তবক্ত্রাং ললজ্জিহ্বাং ভৃকুটীকুটিলালকাম্।
স্বভক্তদ্বেষিণাং রক্তং পিবন্তীং পানপাত্রতঃ॥৩৯॥
সপ্তধাতূন্ শোষয়ন্তীং ক্রুরদৃষ্টয়া বিলোকনাত্।
ত্রিশূলেন চ তজ্জিহ্বাং কীলয়নতীং মুহুর্মুহঃ॥৪০॥
পাশেন বদ্ধা তং সাধমানবন্তীং তদন্তিকে।
অর্দ্ধরাত্রস্য সময়ে দেবীং ধায়েন্মহাবলাম্॥৪১॥
য়স্য য়স্য বদেন্নাম জপেন্মন্ত্রং নিশান্তকে।
তস্য তস্য তথাবস্থাং কুরুতে সাপি য়োগিনী॥৪২॥
ওঁ বলে মহাবলে অসিদ্ধসাধনী স্বাহেতি।
অমোঘাং পঠতি সিদ্ধাং শ্রীবৈষ্ণীম্॥৪৩॥
শ্রীমদপরাজিতাবিদ্যাং ধ্যায়েত্।
দুঃস্বপ্নে দুরারিষ্টে চ দুর্নিমিত্তে তথৈব চ।
ব্যবহারে ভেবেৎসদ্ধিঃ পঠেদ্বিঘ্নোপশান্তয়ে॥৪৪॥
য়দত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া
বিসর্গবিন্দ্বহক্ষরহীনমীডিতম্।
তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রয়ান্তু মে
সঙ্কল্পসিদ্ধিস্তু সদৈব জায়তাম্॥৪৫॥
তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশাসি মহেশ্বরি।
য়াদৃশাসি মহাদেবী তাদৃশায়ৈ নমো নমঃ॥৪৬॥

এই স্তোত্র বিধিপূর্ণ পাঠ করলে সে সব প্রকার রোগ তথা সব প্রকার শত্রু আর সব বাঁধা,দোষ নষ্ট হয় । বিশেষ রূপে মামলায় সফলতা আর রাজকীয় কার্যতে অপরাজিত থাকার জন্য রহনে এটি পাঠ করা বিশেষ ফলপ্রসু ।

শ্রীদুর্গা আপদুদ্ধারাষ্টকম্ অথবা দুর্গাপদুদ্ধারস্তোত্রম্

দুর্গাপদুদ্ধারস্তবরাজঃ
নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥১॥
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিবিজ্ঞানরূপে।
নমস্তে নমস্তে সদানন্দ রূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥২॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৩॥
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে জলে
সঙ্কটে রাজগৃহে প্রবাসে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তার হেতুর্নমস্তে
জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৪॥
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
বিপদসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৫॥
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডোদোর্দণ্ডলীলা
সমুৎখণ্ডিতা খণ্ডলাশেষশত্রোঃ।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৬॥
ত্বমেকা সদারাধিতা সত্যবাদিন্যনেকাখিলা
ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইডা পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাডী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৭॥
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে
সদাসর্বসিদ্ধি প্রদাতৃস্বরূপে।
বিভূতিঃ সতাং কালরাত্রিস্বরূপে

BANGL

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৮॥
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিমনুজপশূনাং দস্যভিস্ত্রাসিতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥৯॥
ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকম্।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদ্ঘোরসঙ্কটাত্॥১০॥
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে।
সর্বং বা শ্লোকমেকং বা য়ঃ পঠেদ্ভক্তিমান্ সদা॥১১॥
স সর্ব দুষ্কৃতং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমং পদম্।
পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে॥১২॥
স্তবরাজমিদং দেবি সঙ্ক্ষেপাৎকথিতং ময়া॥১৩॥

ইতি শ্রীসিদ্ধেশ্বরীতন্ত্রে উমামহেশ্বরসংবাদে শ্রীদুর্গাপদুদ্ধারস্তোত্রম্॥ হরগৌরীসংবাদে আপদুদ্ধারাষ্টকস্তোত্রং

BAN COM

॥দুর্গাতত্ত্ব–৫॥

মা দুর্গা ও তাঁর পরিবারের বাহন পরিচিতি:-

****

বাহন প্রত্যেক বাহন এক একটা এলাকার জনজাতির এক একটা টোটেম ছিল আর্যরা আসার আগে। - জনজাতিদের টোটেম করার অর্থ সামাজিকভাবে সেই টোটেম বা প্রাণীটিকে রক্ষা করা।আদিম জন জাতিদের প্রকৃতি থেকে পাওয়া শিক্ষা তাদেরকে শিখিয়েছে সহাবস্থান।

বর্তমানে যে দুর্গা মূর্তিতে পুজো হয়ে থাকে সেখানে দুর্গার সঙ্গে থাকে সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশের মূর্তি। সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকের মতে, দেবী দুর্গার সংসারে সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশ যথাক্রমে আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণ শূদ্র এই চতুর্বর্ণকে উপস্থাপিত করে। ওই চারমূর্তির আবার থাকে চারটে আলাদা আলাদা-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-বাহন। মনে করা হয়, আদিম মানুষ যখন বিভিন্ন কৌম সমাজে অবস্থান করত তখন যে সব জীবজন্তু তাদের গোষ্ঠীপ্রতীক বা টোটেম ছিল, পরবর্তীকালে সেই সব জীবজন্তু বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনের আসন লাভ করেছে।

সেই সূত্রে অনেক সমাজবিদ মনে করেন, দুর্গার সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী মূর্তি সম্ভবত আর্য অনার্য দ্বন্দ্বের এক-ধর্মীয় সাংস্কৃতিক রূপ, যেখানে গৌরবর্ণা দুর্গা কোনও সিংহ প্রতীক যুক্ত আর্য গোষ্ঠীর এবং ঘন সবুজ বা কৃষ্ণ বর্ণের মহিষাসুর কোনও মহিষ প্রতীক যুক্ত অনার্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকে বোঝায়।

মহিষাসুরমর্দিনী বা দুর্গাকে আমরা পূজা করি তাঁর পরিবারসমন্বিতরূপে। কেন সপরিবারে দেবীর আরাধনা-, তার কিছু তাৎপর্য আমরা এখানে সন্ধান করতে চেষ্টা করব। দুর্গার ডান দিকে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা লক্ষ্মী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশ। বাম দিকে কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিক ও কনিষ্ঠ কন্যা সরস্বতী এবং ওপরের চালচিত্রে স্বামী শিব। বাঙালির নিজস্ব পরিকল্পনায় এ হলো দুর্গার পরিবার। অবশ্য স্বামীকন্যারাই নন-পুত্র-, দেবীর সঙ্গে আছে তাঁর বাহন সিংহ, তাঁর অন্যতম অঙ্গভূষণ সাপ। সেইসঙ্গে পুত্রকন্যাদের বাহনরাও আছে। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা-, গণেশের ইঁদুর, সরস্বতীর হাঁস, কার্তিকের ময়ূর। আছে স্বামী শিবের বাহন ষাঁড়। দুর্গা যেহেতু দেবাদিদেবের ঘরনি, তাই দেবদেবী-রা সবাহন উপস্থিত ওপরের চালচিত্রে। সেখানে মানুষের উপস্থিতিও আছে। আছেন সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নসহ রামচন্দ্র। আছেন রাধাকৃষ্ণ। রামচন্দ্রের হনুমান ও কৃষ্ণের গরুড়ও বিদ্যমান। অসুর হিরণ্যকশিপু-, ভক্ত প্রহ্লাদ এবং নৃসিংহ অবতারও চালচিত্রে বিধৃত। দুর্গা ত্রিভুবনেশ্বরী পাতালের-মর্ত্য-ত্রিভুবনই তার আবাস। সুতরাং স্বর্গ - সব অধিবাসীই তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বাহনদের মধ্যে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। সেখানে গৃহপালিত, বন্য, জলচরউভচর-স্থলচর-, অহিংসসহিংস-, পদবিশিষ্ট সরীসৃপ, দিবাচরনিশাচর-, ক্ষুদ্র বৃহৎ সব শ্রেণির-

পশুপাখির প্রতিনিধিত্ব। শুধু প্রাণিজগৎ নয়, উদ্ভিদ জগৎও বাদ যায়নি। সাধারণের মধ্যে-'কলাবউ' এবং লোকবিশ্বাসে 'গণেশের বধূ' বলে যার পরিচিতি এবং গণেশের ডান পাশে যার স্থান, সেই নবপত্রিকা আসলে সমগ্র উদ্ভিদজগতের এবং বসুন্ধরার প্রতিনিধি। শাক, কন্দ, ওষধি এবং বৃক্ষ সব -শ্রেণির উদ্ভিদের পল্লব নবপত্রিকায় সমন্বিত। মানুষ, অসুর, দেবতা, পশুপাখি, সরীসৃপ, উদ্ভিদ বিশ্বচরাচরের সব জীবই মায়ের - পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। যাঁর বা যাঁদের কল্পনা ও ভাবনায় এ বিশ্ববীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর বা তাঁদের উদারতা ও মৌলিকতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।অন্যদিকে এইসব বাহনেরা জীবনের কিছু অর্থপূর্ণ দিকও নির্দেশ করে।

দেবীর পরিবারের কর্তা শিব। দেবীর পরিবার ও বাহন সম্পর্কে এবং অবশ্যই শিব সম্পর্কে কিছু কৌতুকপ্রদ প্রসঙ্গ রয়েছে লোককথায়। সেখানে শিবের বিবাগী হওয়ার, পোশাক ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে উদাসীন হওয়ার কারণ বলা হয়েছে। শিব কুটুম্বকলহে জর্জরিত হয়ে-, পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক আক্রোশ ও বৈরিতা দেখে বিরক্ত হয়ে বিবাগী হয়েছেন। কী রকম কলহ, আক্রোশ ও বৈরিতা? শিব দেখলেন, কার্তিকের ময়ূর দেবীর হাতে ধরা সাপকে আক্রমণ করতে উদ্যত, সাপ একদিকে সরস্বতীর হাঁসকে, আবার অন্যদিকে লক্ষ্মীর পেঁচাকে ও গণেশের ইঁদুরকে ছোবল দেওয়ার সুযোগ খুঁজছে। লক্ষ্মীর নিশাচর বাহন পেঁচা আবার ইঁদুরকে আক্রমণ করার সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত। অন্যদিকে দেবীর বাহন সিংহ শিবের ষাঁড়কে মারার জন্য হুঙ্কার দিচ্ছে। এর ওপর রয়েছে কার্তিক ও গণেশের মধ্যে কলহ। গণেশের হাতিমুখ এবং বিশাল পেট নিয়ে কার্তিক প্রায়ই পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে গণেশকে উত্ত্যক্ত করে। ভাইদের বিবাদে দেবী সর্বদা জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশের পক্ষে দাঁড়ান। এ ছাড়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে ঈর্ষা ও সে জন্য কলহ, চুলোচুলিও আছে। লক্ষ্মীর অভিমান তাঁর রূপ নিয়ে, সরস্বতীর গুণ নিয়ে। দেবী কখনও লক্ষ্মীর পক্ষে, কখনও সরস্বতীর পক্ষে দাঁড়ান। শিব যেহেতু পরিবারের কর্তা এবং সন্তানদের পিতা, তাই তিনি সবার প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। কারও প্রতি তাঁর স্নেহ বা আদরের পক্ষপাতিত্ব নেই। প্রত্যেকের বাহন সম্পর্কেও তাঁর সমান উদার স্নেহদৃষ্টি। কিন্তু দৈনন্দিন পারিবারিক কলহ ও বৈরিতাকে সদানন্দময় আত্মতুষ্ট শিব কোনোভাবেই প্রশমিত করতে সমর্থ না হয়ে শেষে বিবাগী হয়ে গেলেন। হতাশাগ্রস্ত মানুষ যেমন নেশার মধ্যে ডুবে হতাশাকে ভুলতে চেষ্টা করে, সে রকম দেবীর পরিবারের কর্তাও সিদ্ধি-ভাঙের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন। পোশাক-পরিচ্ছদেও তিনি উদাসীন।

দুর্গা, তাঁর বাহন সিংহ, তাঁর পুত্র কন্যা ও বাহন এক বা একাধিক গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ভাবের প্রতীক এবং-স্বরূপিণী। সর্বতত্ত্ব ও সর্বভাব তাতে সমন্বিত। বিজ্ঞান বিশ্বাসের-দুর্গা স্বয়ং সর্বতত্ত্ব ও সর্বভাবের সমষ্টি এবং উৎস মধ্যে দিয়ে অভ্যাসে পরিণত করাররীতিকে প্রথা নাম দেওয়া হয়,প্রথাকে কেমন ভাবে মেনে চলতে হবে এই নিদানে থাকে বশ্যতা আর বশ্যতা চায় অন্ধত্ব। এর মজাটা হল এভাবে বিজ্ঞান চেতনা সংস্কারের চেহারা নিয়ে ফেলে মানুষের ভেতরে।

দুর্গা এবং সিংহ:-

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত মূর্তিতে আদিতে বাহন হিসেবে বাঘের দেখা মিললেও দেবী দুর্গা বহু জায়গাতেই সিংহবাহিনী। এত পশু থাকতে কেবল সিংহই কেন দুর্গার বাহন তা নিয়ে কৌতুহল জাগে বৈকী অনেক শাস্ত্রকার ! বলে থাকেন, শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা অনুসারে দেবতাদের সম্মিলিত তেজঃপুঞ্জ থেকে দেবী দুর্গার উদ্ভব হবার পর দেবকুল তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে দেবীকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করে তোলেন। তখন হিমালয় দুর্গাকে তাঁর বাহন সিংহ দান করেন। চণ্ডী গ্রন্থে দেবীর বাহন সিংহকে ‘বাহনকেশরী’, ‘ধূতসট’ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। সিংহ রজোগুণের অধিকারী এক প্রচণ্ড শক্তি ও উচ্ছ্বাসের প্রতীক। এবং দেবী দুর্গা স্বয়ং অত্যন্ত বলশালিনী ও শৌর্যবতী বলেই সিংহের মত প্রাণীকে বশে রাখতে পারেন। সেই থেকে সিংহ দুর্গার বাহন।

প্রথমে আসা যাক দেবী দুর্গার বাহন হিসেবে সিংহের কথায়।সিংহ হলো দুর্গার তেজ, ক্রোধ ও হিংস্রতার প্রতীক। হ্যাঁ, একথাই বলা আছে পদ্মপুরানে। যদিও পদ্মপুরানে আরও বলা আছে যে, দুর্গার ক্রোধ থেকে সিংহের জন্ম হয়।যেকোনো যুদ্ধে জয়ী হতে গেলে যে সিংহের মতো শক্তি, রাগ, ক্ষিপ্রতা ও হিংস্রতার দরকার, সিংহকে সাথে রেখে দুর্গা সেই তথ্যটিও তার ভক্ত বা পূজারীকে দেয়।

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদকাঞ্চীক্বণন্নূপুরা-রণৎ-কঙ্কণ-হার-
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥

{শ্রীশ্রীচণ্ডী, মহাসরস্বতীর ধ্যান, শ্লোক - ২}

[সিংহারূঢ়া শশিশেখরা, মরকতমণির তুল্য প্রভাময়ী, চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র ও ধনুর্বাণ ধারিণী, ত্রিনয়ন দ্বারা শোভিতা, কেয়ূর, হার ও বলয় এবং মৃদু মধুর ধ্বনিযুক্তা চন্দ্রহার ও নূপুর পরিহিতা এবং রত্নে উজ্জ্বল কুণ্ডল-[ভূষিতা দুর্গা আমাদের দুর্গতি নাশ করুন।

আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলেও প্রশ্ন ওঠে, যে সমস্ত পুরাণ থেকে দেবী দুর্গা সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলোর রচনাকাল ষষ্ঠ শতকের আগে নয়, কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাটির তলা থেকে যে সব দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে খ্রিস্টের জন্মের আগের সময়ের মূর্তিতেও দেবীর বাহন হিসেবে সিংহের উপস্থিতি রয়েছে। সমাজবিদদের কেউ কেউ মনে করেন, প্রাপ্ত দুর্গার মূর্তিগুলির দু’টি রূপ পাওয়া যায়– মহিষমর্দিনী এবং সিংহবাহিনী। এর মধ্যে সম্ভবত মহিষমর্দিনী রূপটিই প্রাচীন। রাজস্থানের নাগোর থেকে পাওয়া আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ফলককে মহিষমর্দিনী রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সিংহবাহিনী রূপটি সম্ভবত এসেছে ভারতের বাইরে থেকে। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকেই খ্রিস্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতকে নির্মিত মহিষমর্দিনী ও সিংহবাহিনীরূপী দেবীমূর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।- ওই সময়কার কিছু পাথরের তৈরি চর্তুভুজা, ষড়ভুজা, অষ্টভুজা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি আবার সিংহবিহীন। উত্তরপ্রদেশের নিকটবর্তী ভিটা ও বিহারের বৈশালী অঞ্চলে পাওয়া সিলমোহরের মহিষমর্দিনী মূর্তিতে সিংহ নেই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সিংহসহ মহিষমর্দিনী মূর্তি এসেছে সপ্তম শতাব্দী থেকে। অর্থাৎ-, বুদ্ধযুগ থেকে হিন্দুযুগে প্রত্যাবর্তনের গোড়ার দিক থেকে মহিষমর্দিনী মূর্তি আস্তে আস্তে সিংহবাহিনী হয়ে উঠেছে।

সরস্বতী এবং রাজহাঁস:-

ভারতীয় পুরাণ সংস্কৃতিতে সরস্বতী বহুমাত্রিক দেবী হিসেবে পরিচিত এবং তাঁর বাহন হাঁস। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও- দেখা যায়। পশ্চিম ভারতের কোথাও কোথাও সরস্বতীর বাহন হিসেবে ময়ূরের উপস্থিতি লক্ষণীয়

আদিতে সরস্বতীর পরিচয় ছিল উত্তর ভারতের সপ্তনদীর গঙ্গা), যমুনা, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও সরস্বতীঅন্যতমা সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে। (

পদ্মপুরাণে সরস্বতী দক্ষকন্যা এবং কশ্যপপত্নী হিসাবে স্বীকৃত।- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে সরস্বতী বিষ্ণু বা নারায়ণের পত্নী। শিবপুরাণ আর স্কন্ধপুরাণ মতে সরস্বতী আবার শিবেরও পত্নী। ঋগ্বেদ পরবর্তী হিন্দু শাস্ত্র- এর পত্নী রূপে ব্যখ্যাত হলেও-মহেশ্বর এই ত্রিদেব-বিষ্ণু-আলোচনায় সরস্বতী ব্রহ্মা, অধিক প্রচলিত মতে তিনি নারায়ণপ-ত্নী। কিন্তু ওই সব কাহিনির কোথাও সরস্বতীর বাহনের উল্লেখ না থাকলেও ‘মৎসপুরাণ’ অনুসারে, পরমাত্মার মুখনিঃসৃত শক্তিগুলির মধ্যে সরস্বতী সর্বশ্রেষ্ঠা। তিনি রূপে দেবীর ন্যায় পরমা সুন্দরী। মহাশ্বেতা ও বীণাবাদিনী। কিন্তু জন্ (সর্বশুক্ল বা যার সর্বাঙ্গ শ্বেত বর্ণের)ম নেওয়ার পর তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা সরস্বতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ব্রহ্মার দৃষ্টি থেকে বাঁচতে সরস্বতী অন্য দিকে সরে যেতে থাকেন। কিন্তু তিনি যে দিকে সরেন সে দিকেই ব্রহ্মার একটা করে মুখ তৈরি হয়। এই ভাবে ব্রহ্মার পাঁচটা মাথা গজাল। শেষে সরস্বতী রাজহংসীর রূপ ধরে বনে পালিয়ে গিয়েও ব্রহ্মার কাম থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। ব্রহ্মাও রাজহাঁসের রূপ ধরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। সরস্বতীর ওই ছদ্মরূপই হয়ত পরবর্তীকালে তাঁর বাহন হিসেবে পদতলে স্থান পেয়েছে বলে মনে করা হয়।

সরস্বতীর সাথে থাকা রাজহাঁসের এই ক্ষমতা আছে যে, দুধ ও জল মিশিয়ে দিলেও সে শুধু দুধকেই পান করতে পারে বা গ্রহন করতে পারে। বিদ্যার দেবী সরস্বতীর সাথে থাকা রাজহাঁসসমাজে -, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে এই বার্তা দেয় যে, সমাজে ভালো মন্দ সব ধরণের জ্ঞানই আছে, তার মধ্য থেকে শুধু ভালোটাকেই গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও সরস্বতীর হাতের পুস্তক যে পড়াশোনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের কথা বলে সেটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না; তারপর সরস্বতীর হাতের বীণা বলে শিল্পসংস্কৃতি চর্চার কথা-, যে শিল্প সাধনা

মানুষকে সাধারণ থেকে অসাধারণ এবং মানুষের মানবতার মাপকাঠিকে এক উচ্চ মাত্রায় নিয়ে গিয়ে মানুষকে মহান করে তুলে।

কার্তিক এবং ময়ূর:-

কার্তিক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হল তিনি শিবপার্বতীর দ্বিতীয় পুত্র-, রণনিপূণ, ময়ূরবাহন, স্বর্গরাজ্য বা দেবতাদের সেনাবাহিনীর প্রধান। অন্যান্য দেবদেবীর মতই কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে নানা ধরনের ভাষ্য রয়েছে।

মহাকবি কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে 'কুমার' অর্থাৎ, কার্তিকের জন্মের পূর্বকথা বর্ণনা করেছেন। প্রথমে প্রত্যাখ্যাতা হওয়ার পর পার্বতী নিজের রূপকে ধিক্কার জানিয়ে শিবকে পতি রূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যায় বসলেন। পার্বতীর তপস্যায় তুষ্ট মহাদেব এক সময়ে তাঁকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মহা সমারোহে বিয়ে হল হরপার্বতীর এবং তার পর কুমার কার্তিকের জন্ম। আর একটি তত্ত্ব অনুসারে বলা হয়-, শিবের স্খলিত বীর্য আকাশগঙ্গার গর্ভে সঞ্চারিত হয়ে এক পুত্রের জন্ম দেয়। আকাশগঙ্গা তাকে শরবনে ত্যাগ করে যান। ছ'জন কৃত্তিকা এই কুমারকে দেখতে পেয়ে পালন করেন বলে তাঁর নাম হয় 'কার্তিক'। একই সঙ্গে পালনকারী ছ'জন কৃত্তিকার স্তন্য পান করবার ব্যগ্রতায় কার্তিকের ছ'টি মুখ তৈরি হয়। এজন্য তাঁর নাম 'ষড়ানন'। কোনও কোনও সমাজবিদ বলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষের মৌর্য বংশের রাজত্বের সমকালে উত্তরপশ্চিম ভার-তের হরিয়ানা সংলগ্ন অঞ্চলে যৌধেয় নামে এক কার্তিক প্রতীক ছিল ময়ূর।-উপাসক রণনিপূন গোষ্ঠী বসবাস করত। তাদের গোষ্ঠী-উপাসক হওয়ার কারণেই হয়ত মৌর্যদের সঙ্গে তাদের সখ্য-এরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়া সত্বেও ময়ূর ছিল। এবং সম্ভবত সেই থেকেই ময়ূর কার্তিকের বাহন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

কার্তিকের সাথে থাকে একটি ময়ূর এবং ময়ূরের পায়ের তলে থাকে একটি সাপ। কার্তিক হলো যুবক, যোদ্ধা ও সৌন্দর্যের প্রতীক; ময়ূর, কার্তিকের এই তিনটি গুণেরই প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা, কার্তিক যেমন চিরযুবা, তেমনি মৃত্যু পর্যন্ত ময়ূরের সৌন্দর্য ও তারুণ্যও কখনো নষ্ট হয় না। এছাড়াও ময়ূর সকল পাখির মধ্যে ভয়ংকর যোদ্ধা, যেমন ভয়ংকর যোদ্ধা হলো কার্তিক, এজন্যই কার্তিককে দেওয়া হয়েছে দেবতাদের সেনাপতির সম্মান।

সাপ হলো গোপন ষড়যন্ত্রের প্রতীক এবং যে কোনো যুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র থাকবেই। ময়ূরের পায়ের নিচে সাপের অর্থ হলো, শুধু যুদ্ধ করলেই হবে না, যুদ্ধের এই গোপন ষড়যন্ত্রকেও দমন করতে হবে, যেমন ময়ূর নিমিষের মধ্যে একটি সাপের দেহকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে পারে।

লক্ষ্মী এবং প্যাঁচা:-

বৈদিক শাস্ত্র ও বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে লক্ষ্মীর উদ্ভব ও পরিচিতি নিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিছু পুরাণ অনুযায়ী লক্ষ্মী দেবসেনা রূপে জন্ম নিয়ে কার্তিকেয়র পত্নী হন। আবার কিছু পুরাণ মতে তিনি গণেশপত্নী। নদীরূপিনী সরস্বতীই আদিতে উর্বরতা ও শস্যদায়িনী দেবী। পরে লক্ষ্মীসরস্বতী একরূপে গণ্য হবার সময় থেকে- শস্য ও সেই সূত্রে সম্পদের দেবী হিসাবে লক্ষ্মীকে গণ্য করা আরম্ভ হয়। আবার শস্যের দেবী হিসাবে গণ্য হবার কারণে লক্ষ্মীকে ধরিত্রী বা বসুমতী হিসাবেও ভাবা আরম্ভ হয়।

আদতে এই লক্ষ্মীদেবী অনার্য দেবী। তাঁকে আর্য সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করতে গড়া হল সমুদ্রমন্থনের কাহিনি। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত দুর্বাসার দেওয়া মালা ছিড়ে ফেললে, মুনির শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীহীন হয়ে পড়েন। স্বর্গচ্যুত লক্ষ্মী আশ্রয় নেন সমুদ্রতলে।

লক্ষ্মীর সাথে থাকা পেঁচা, রাতের কঠিন অন্ধকারেও দেখতে পায়। অন্ধকার হলো বিপদ আপদের প্রতীক। ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর সাথে থাকা পেঁচা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যদি ধনসম্প-দ বা টাকা পয়সা থাকে- তাহলে বিপদ আপদ যত বড় আর কঠিনই হোক না কেনো, রাতের আঁধার ভেদ করে পেঁচা যেমন তার পথ দেখতে পায়, তেমনি ধনসম্পদের জোরে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিও ঠিক পথ খুঁজে পাবে এবং তা থেকে উদ্ধার পাবেই।-

হিন্দুদের একটি দেবী লক্ষ্মী হচ্ছে ধন সম্পদের দেবী, এর মানে হলো কোনো হিন্দু গরীব বা ভিখারী থাকবে না বা থাকতে পারবে না, প্রবাদ প্রচলিত আর এজন্যই হিন্দু শাস্ত্রে দারিদ্রতাকে মহাপাপ বলা "ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ " হয়েছে, যাতে সবাই চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের দারিদ্রতাকে দূর করে; কারণ, যে ব্যক্তি দরিদ্র অর্থাৎ অর্থ ও বিত্তহীন, তার সামনে সবই অন্ধকার এবং তার জীবনে কোনো সুখ নেই। কোনো হিন্দু অর্থ বিত্তহীন হয়ে- সাংসারিক জীবনে অসুখী থাকবে, এটা সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য নয়; এজন্যই সনাতন ধর্মে দারিদ্রতাকে দূর করতে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পেঁচার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো গোপনীয়তা; কেননা, সে গোপন থাকার কারণেই দিনের বেলা বের হয় না, লক্ষ্মীর সাথে থাকা পেঁচা মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে, অর্জিত ধনসম্পদকে রাখতে হবে গোপনে-; না হলে সেই ধনসম্পদ বা অর্থকড়ি নানারকম সমস্যা বা বিপত্তির সৃষ্টি করবে-, তখন অর্থ হয়ে যাবে অনর্থ। এজন্যই প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে অর্থই অনর্থের মূল।

গণেশ এবং ইঁদুর:-

গনেশকে বিশ্বাস করা হয় সিদ্ধিদাতা হিসেবে এবং গনেশের সাথে থাকে ইঁদুর। সিদ্ধি মানে সাকসেস বা সফলতা। তো পৃথিবীর এমন কোনো সফল ব্যক্তি নেই, যাকে নানা রকম বাধা বিপত্তি ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন-করে এগিয়ে যেতে হয় নি। সাফল্যের পথে নানারকম বাধা বিপত্তি একটা সাধারণ ব্যাপার, সেটা মানুষ ধৈর্য ও মনের জোরে দূর করতে পারে; কিন্তু কারো সাফল্যের পথে যদি ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো থাকে, তাহলে তার পক্ষে সাফল্য লাভ করা অনেক ক্ষেত্রে শুধু অসম্ভবই নয়, এই ষড়যন্ত্রের জাল তাকে ধ্বংসও করে ফেলে পারে। তাই গনেশের সাথের ইঁদুর, মানুষকে এই বার্তা দেয় যে, সাফল্যের পথের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং যত ষড়যন্ত্রই হোক, সাফল্য পেতে চাইলে সেই ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, ঠিক ইঁদুরের মতো; কারণ, জাল দিয়ে পৃথিবীর প্রায় সব প্রাণীকে আটকানো গেলেও ইঁদুরকে কেউ আটকাতে পারে না, ইঁদুর জালকে কেটে বের হয়ে আসতে পারেই, এজন্যই গণেশের সাথে থাকে ইঁদুর এবং ইঁদুর মানুষকে উপরের এই তথ্যগুলোই শিক্ষা দেয়।

এখন শিব ও দুর্গার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সর্বদেবতার অগ্রে পূজ্য গণেশের কথা। 'গণেশ' (গণশব্দের অর্থ গণনায়ক (ঈশ+, গণপতি। 'গণ' শব্দের একটি অর্থ সঙ্ঘ বা সমষ্টি। সঙ্ঘ বা সমষ্টির যিনি ঈশ্বর বা নায়ক বা পরিচালক তিনি গণেশ। সঙ্ঘশক্তি বা সমষ্টিশক্তিই যথার্থ শুভশক্তি। সেই শক্তি যেখানে সংহত সেখানেই সর্বকল্যাণ নিহিত। ইংরেজি প্রবাদবাক্যে বলা হয় একতাই শক্তি :; সংঘবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ থাকলে অভ্যুদয়, আর ঐক্যহীনতায় পতন। পৌরাণিক কাহিনীতে দেবী দুর্গা হচ্ছেন ঐক্যবদ্ধ দেবশক্তির সংহত বা ঘনীভূত রূপ। সুর ও অসুরের সংগ্রামে, শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বে গণেশ সংহতির প্রতীক। গণেশের মুখ হাতির আর পায়ের কাছে বাহন ইঁদুর। হাতি জীবজন্তুর মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং দৈহিক শক্তিতেও সবার প্রধান। ইঁদুর জীবজন্তুর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ও সবার চেয়ে উপেক্ষিত; কিন্তু ইঁদুরের বুদ্ধি খুব প্রখর। স্বজাতীয়দের মধ্যে এই দুই অসম জীবকে দেহের দুই প্রান্তে স্থাপন করে দেশদেশান্তরের সব মানুষের সঙ্গে সংহতি স্থাপনের এক অপূর্ব ভাব গণেশের মধ্যে পাও-য়া যাচ্ছে। 'গণ' শব্দের আর একটি অর্থ

সৈন্যবাহিনী। নতুন সমাজ, নতুন পৃথিবী গঠনে সেনাপতি হওয়ার অধিকারী তিনিই, যিনি নিজের মধ্যে শক্তি ও বুদ্ধিকে সমন্বিত করতে পারেন। দেবী পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য অসুর নিধনে মহাসংগ্রামে অবতীর্ণ। সে সংগ্রামে সবাহন গণেশ তাঁর সহযোগী। আবার গণেশ গণনায়ক। 'দিগ্‌গজ' অর্থাৎ সমাজের অসাধারণ ও বিশেষ অধিকারভোগী এবং ‘নরমূষিক-' অর্থাৎ সাধারণ ও অবহেলিত গণমানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার দায়িত্ব তাঁর। সমাজে 'দিগ্‌গজ' মানুষের অর্থাৎ বিশিষ্টজনের ভূমিকা অনস্বীকার্য; কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ইঁদুরের মতো অগণিত অথচ উপেক্ষিত মানুষের সংখ্যা ও ভূমিকা সর্বাধিক। গণেশ এই উভয়ের মধ্যে সংহতির প্রতীক। গণেশ সিদ্ধিদাতা। শক্তি ও বুদ্ধি যেখানে সমন্বিত, সংগ্রামের স্পৃহা যেখানে সদা জাগ্রত, সংহতির প্রেরণা যেখানে

পাথেয়, সর্বসিদ্ধির প্রাপ্তি তো সেখানে সুনিশ্চিত। নারদ পুরাণে বলা হয়েছে, গণেশের প্রসন্নতায় বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে, ধনার্থী ধন, পুত্রার্থী পুত্র এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে।

শাস্ত্রমতে, সিদ্ধির পথে অন্তরায় অনেক। 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'। সেই অন্তরায়গুলো দূর করতে হলে প্রয়োজন শ্রমশীলতা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়। গণেশের বাহন ইঁদুরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো শ্রমশীলতা, একাগ্রতা এবং অধ্যবসায়। অতি ক্ষুদ্র জীব হলেও সে তার শ্রমশীলতা, একাগ্রতা এবং অধ্যবসায়ে কঠিন পাথর কেটে গৃহ গর্ত-করে নেয়। সঞ্চয় করা ইঁদুরের আর একটি স্বভাব। পাকা ধানের শিষ একটু একটু করে সে সংগ্রহ করে এবং ক্ষেতের নিচে গর্ত করে সঞ্চয় করে। সিদ্ধিলাভ করতে হলে পাথেয় বা শক্তি সঞ্চয় প্রয়োজন। ুকি আধ্যাত্মিক জীবনে, কি ব্যবহারিক জীবনে ইঁদুরের এই স্বভাব আমাদের অনুকরণযোগ্য। ইঁদুরের আর একটি প্রতিশব্দ 'মুষিক'। 'মুষ' ধাতুর অর্থ চুরি করা। সায়নাচার্য বলেছেনজীবের কর্মফলগু -লো অপহরণ করে বলে এর নাম 'মুষিক'। শাস্ত্রমতে, সিদ্ধির প্রধান প্রতিবন্ধক কর্মফল। ক্ষুদ্রকায় মুষিকের শানিত ছেদনদন্তের দ্বারা পাশবদ্ধ পশুরাজ সিংহকে মুক্ত করার উপাখ্যান লোকপ্রসিদ্ধ। কর্মপাশ ছেদনের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানরূপ শক্তিশালী ছেদনদন্ত। সুতরাং শক্তিশালী গণেশের মুষিকবাহনের তাৎপর্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।-

শিব এবং নন্দী:-

প্রচলিত মতে, শিবের বাহন হলো নন্দী নামের একটি ষাঁড়; এর কারণ কী বা শিবের সাথে থাকা একটি ষাঁড় আসলে আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয় ?

সনাতন ধর্মশাস্ত্র মতে, সাধারণভাবে শিব হলো ধ্বংসের দেবতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ধ্বংসকারী রূপের নাম হলো শিব। কারণ, শিব আলাদা কোনো সত্ত্বা নয়, এজন্যই গীতার ১০ নং শ্লোকে বলা ২৩/ হয়েছে,

“রুদ্রানাং শঙ্করশ্চাস্মি”

এর অর্থ হলো রুদ্রদের মধ্যে আমিই শিব।–

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, তিনিই শিব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই যে পরমব্রহ্ম বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর তার প্রমাণ কী ?

গীতার ১৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে ২৭/,

“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।”

এর অর্থ আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণই যে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম, তা গীতার এই বাণী থেকে প্রমাণিত।

উপরের এই আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত যে, শিব আলাদা কেউ নয়; শিব, ঈশ্বরেরই ধ্বংসকারী একটি রূপের নাম, কিন্তু শিবের সাথে ষাঁড় থাকার রহস্যটা কী ?

যে ধ্বংস করবে, তাকে হতে হয়একগুঁয়ে -, জেদি এবং বিশেষ শক্তিসম্পন্ন। একটা প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড় গরুর দেহে যে পরিমান শক্তি থাকে, তাতে সে একটি পাড়া বা ছোটখাটো গ্রামকে কয়েক মিনিটের মধ্যে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে; শুধু একজন বা কয়েকজন কেনো, একদল মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয় সেই উন্মত্ত ষাঁড়কে রোধ করা; শিবের সাথে থাকা ষাঁড় আসলে শিবের সেই তান্ডব ধ্বংস বা তাণ্ডব রূপেরই বহিঃপ্রকাশ।আবার সনাতন শাস্ত্র মতে নন্দী ষাঁড় একজন ঋষি যিনি আজীবন শিবের আরাধনা করে চলেছেন।

শিবের বাহন ষাঁড়। 'ষাঁড়' শব্দের শুদ্ধ প্রতিশব্দ ‘বৃষভ।’ ‘বৃষভ’ শব্দের একটি অর্থ শ্রেষ্ঠ। ষাঁড় যখন সংযত, তখন তার মতো শান্ত, নিরীহ লোকহিতকর প্রাণী বিরল। কিন্তু ষাঁড় যখন ক্রুদ্ধ, অর্থাৎ অসংযত, তখন সে দুর্ধর্ষ এবং ভয়ঙ্কর। শিব এবং রুদ্রশিবের এই দু -'রূপ। দু'রূপেই তিনি দেবশ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত সংযমের মধ্যেই। সংযমেই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আমাদের প্রত্যেকের মনে রয়েছে সংযম ও অসংযমের বৃত্তি। একটি লোকহিতকর, অন্যটি লোকক্ষয়কারী। অসংযমকে সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই শান্তি। শিব তাঁর চরিত্রের শান্ত সমাহিত সত্তাকে তাঁর বাহনের মধ্যে সঞ্চারিত করে তবে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত রাখেন।- আমাদেরও তাই প্রচণ্ড কর্মশীলতাকে প্রগাঢ় প্রশান্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ। যথার্থ উন্নতি ও সমৃদ্ধির রহস্য সেখানেই। দুর্গা স্বয়ং ওই সমন্বয়ের প্রতীক। শিব ও দুর্গার মিলনে তাই অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা।

দেব দেবীদের সাথে যে বাহন থাকে এটা বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ। বিজ্ঞানের একটি শাখা বাস্তুতন্ত্র বা-Ecosystem এবং বিজ্ঞানের নানা চর্চা অতি প্রাচীন কাল থেকেই ছিলো। এর জন্য সমস্ত স্বীকৃতি প্রাচীন কালের মুনি ঋষিদের প্রাপ্য। শাস্ত্রে দেব দেবীদের বাহন দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে প্রতিটি প্রানী পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা না হলে পৃথিবীর ভারসাম্য ঠিক থাকবে না। যেমন মাংশাশী প্রানীরা হিংস্র বলেই তাদের মেরে ফেললে তৃনভোজী প্রানীর সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং অরন্য, বনভূমির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য খাদকের (চেইনটি Chain) ঠিক রাখার জন্য মাংশাশী তৃনভোজী সব প্রকার প্রাণী প্রয়োজন। তাই কোনো কোনো দেব দেবীদের বাহন রূপে বাঘ সিংহ দেখা যায় এবং শাস্ত্রে এদের হত্যা করা নিষিদ্ধ। আবার কোনো কোনো দেবতা দেবীদের বাহন রূপে ইঁদুর, প্যাঁচা, ময়ূর, সাপ, হাঁস, গরু, ঈগল, হাতি ইত্যাদি প্রাণী দেখা যায়।

বাস্তুতন্ত্রে প্রত্যেক প্রাণী একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই প্রক্রিয়ার কোথাও কোনো বিঘ্ন ঘটলে প্রাণীকূলের অস্তিত্ব সংকটে পরবে, সেই কথা ভেবেই প্রাচীন কাল থেকে মুনি ঋষিরা বিভিন্ন দেব দেবীদের সাথে এইসব-প্রাণীদের জুড়ে দিয়েছেন তাদের জীবন রক্ষা করার জন্য।

তাহলে এই কথা মেনে নিতে অসুবিধে নেই যে আমাদের পুরাণে বর্ণিত নিয়মগুলো বিজ্ঞানের ওপর ভর করেই তৈরী।

কোন বাহনের কী মানে?

দেবী দুর্গার আগমন ও কৈলাসে ফিরে যাওয়ার বাহন তিথি, নক্ষত্র এর বিচারে নির্দিষ্ট হয়। পুরাণ ও শাস্ত্র অনুযায়ী সোমবার ও রবিবার দেবীর আগমন বা প্রত্যাগমনের বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয় হাতি। শনি ও মঙ্গলে ব্যবহৃত হয় ঘোড়া। বুধে যান হিসেবে ব্যবহৃত হয় নৌকা এবং বৃহস্পতি এবং শুক্রে ব্যবহৃত হয় পালকি বা দোলা। এই প্রত্যেকটি বাহনের সাথে জড়িয়ে আছে কিছু শুভ ও অশুভ সংকেত। যেমন হস্তীতে গমন এবং আগমন দুটি ক্ষেত্রেই অত্যন্ত শুভ। এর দ্বারা বোঝা যায় যে আমাদের ধরা সুজলা সুফলা হয়ে উঠবে। নৌকো করে আগমনের দ্বারা বোঝানো হয় যে দেবী প্রচুর আশীর্বাদ, ধান, ধন সম্পত্তি নিয়ে মর্তে আসবেন । কিন্তু নৌকা করে ফেরত যাওয়া বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতিকে নির্দেশিত করে। ঘোড়ায় আগমন ও ফিরে যাওয়া দুটিই অত্যন্ত অশুভ। এতে মড়ক, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ে। পালকি বাহনটিও ভূমিকম্প, মহামারী ইত্যাদি ক্ষয়ক্ষতির ইঙ্গিত বহন করে।

দুর্গাতত্ত্ব এক অপূর্ব বৃহৎ দুরূহ তত্ত্ব। আমি নেহাতই আনাড়ি, নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটুকু কুলিয়েছে, লেখার চেষ্টা করেছি মায়েরই কৃপায়, আমার গুরু যিনি সেই শ্রীশ্রী মা সর্বাণী স্বয়ং আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি, তাই তিনি আমাকে এবারে এটুকুই জানিয়েছেন, সেটুকুই ব্যক্ত করেছি।এর বাইরেও আরো বহু কিছু আছে,আবার যদি তিনি কৃপা করেন আবার লেখা হবে। যাঁদের ভালো লেগেছে তাঁদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার গুরু শ্রীশ্রী মা সর্বাণীর উদ্দেশ্যে লেখা এই কবিতা দিয়ে শেষ করি।

প্রসাদ গুণ:-

তোমার কৃপার পরশে মা ইষ্টে হলো মতি,
তোমার শক্তিপাতে মা দৃষ্ট হলো জ্যোতি,
তোমার অভয় মুরতিতে অসীম আশ্বাস,
তোমার মধুরদৃষ্টিতে মা অনাবিল বিশ্বাস।
তোমার অমৃত সঙ্গীতে মা বিশ্ববোধের শ্রুতি,
তোমার স্নিগ্ধ মাধুর্যে মা বিশ্বমাতার দ্যুতি,
তোমার সঙ্গ প্রসাদে মা সকলই হয় ভালো,
জগৎ সর্বাণী মা সর্বাণী ঘুচাও মনের কালো।
তোমার চরণ কমল মা সমাদরে চুমি,
যেথায় তোমার পদরজঃ সেই তো পুণ্যভূমি,
যেথায় তুমি বিরাজ করো সেই তো বৃন্দাবন,

তোমায় ঘিরে বিরাজ করেন সাধুমহাত্মন।–

(১৬ জুলাই, ২০১৯ গুরুপূর্ণিমায় অখণ্ড মহাপীঠের পত্রিকায় প্রকাশিত হিরণ্যগর্ভ)

॥লক্ষ্মীপুজো॥

প্রতিবছর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বড়ো করে হত বাপের বাড়িতে, প্রচুর লোকজন খেত সেদিন আমাদের দেওয়া ভোগ প্রসাদ।বাবার বন্ধু চক্রবর্তীকাকুর বাড়িতে আমার দুপুরের পরে ডিউটি থাকতো গিয়ে ফল কেটে, আনাজ কেটে নারকোল কুরে দেওয়ার, লুচি বেলে দেওয়ার। কারণ ওদের বাড়িতে মেয়ে নেই, তিনটে সাড়ে তিনটে বাজলেই চক্রবর্তীকাকুর মেজদা যাঁকে জেঠু বলতাম এসে দরজার কড়া নাড়তেন আমাদের বাড়ির, "কৈ আমার সরস্বতী মায়ে কখন যাইব জানতে আইলাম।ও পম্পার মা, হেয় কখন যাবে, আমরা সব বইয়া আছি যে ওর লেগে?" মা অমনি আমাকে তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিত ওদের বাড়িতে, আমাদের বাড়ির পুজোর জোগাড় তাই আগে আগে করে দিতে হত। তাঁরা সব কোথায় এখন!!!!একটা গোটা পরিবার শেষ হয়ে গেল কয়েক বছরের মধ্যে!!!!

বিয়ের পরে লক্ষ্মীপুজোয় আগে আগে চলে যেতাম মায়ের কাছে, মা চলে যাবার পরে আস্তে আস্তে নিজে পুজো শুরু করলাম মায়েরই সব ঠাকুরের বাসন, নিজের বাসন আর কিছু শ্বশুরবাড়ির ঠাকুরের বাসন দিয়ে। তারপর থেকে চলছে পুজো মায়ের কৃপায়, আগে আগে বোন আসতো, ওর ছেলেকে নিয়ে। ২০১৯ সালে মুন্নার বেড়াতে গেছিলাম, তাই সেবছর পুজো করেছিলাম আমার গুরু মায়ের নির্দেশে কালীপুজোর দিন। এমনিও ঐদিন লক্ষ্মীপুজো করি আমি।

এবছর কেউ আসেনি, বাড়িতে আমরা তিনজন, খুবই ছোট করে করব বলেও মায়ের ইচ্ছেয় একটু বেশিই চাপ হয়ে গেল, কোজাগরী জল দিয়ে চিঁড়ে নারকোল মাখা, তালের ফোঁপর, পাঁচটা ফল তো দেওয়া হলোই,ভোগ হলো ভালো চালের ফ্রাইড রাইস, পাঁচটা ভাজা, লাবড়া, বাঁধাকপির তরকারি, আমসত্ত্ব-খেজুরের চাটনি, পায়েস, নারকোল নাড়ু আর লুচি। নারায়ণের জন্য লুচি আর সিমুইয়ের পায়েস হলো। তারপরে বসে নিজে পুজো করলাম। পুরোহিতের পুজো আমার একটুও পছন্দ হয়না বলে শেষ আট বছর আমিই করি পুজো। এখন দুদিন আমাকে রান্না করতে হবে না।

তারমধ্যে জানলাম একটু অন্যরকম কিছু মন্ত্রের কথা, সেগুলো নিচে দিলাম।

মহালক্ষ্ম্যষ্টকম্:-

ইন্দ্র উবাচ:-

নমস্তেঽস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে।
শংখচক্র গদাহস্তে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥১॥
নমস্তে গরুডারূঢে কোলাসুর ভযংকরি।
সর্বপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥২॥
সর্বজ্ঞে সর্ববরদে সর্ব দুষ্ট ভযংকরি।
সর্বদুঃখ হরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥৩॥

সিদ্ধি বুদ্ধি প্রদে দেবি ভুক্তি মুক্তি প্রদাযিনি।
মন্ত্র মূর্তে সদা দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥৪॥
আদ্যন্ত রহিতে দেবি আদিশক্তি মহেশ্বরি।
যোগজ্ঞে যোগ সংভূতে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥৫॥
স্থূল সূক্ষ্ম মহারৌদ্রে মহাশক্তি মহোদরে।
মহা পাপ হরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥৬॥
পদ্মাসন স্থিতে দেবি পরব্রহ্ম স্বরূপিণি।
পরমেশি জগন্মাতঃ মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥৭॥
শ্বেতাম্বরধরে দেবি নানালংকার ভূষিতে।
জগস্থিতে জগন্মাতঃ মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥৮॥
মহালক্ষ্মষ্টকং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিমান্ নরঃ।
সর্ব সিদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্যং প্রাপ্নোতি সর্বদা॥
এককালে পঠেন্নিত্যং মহাপাপ বিনাশনম্।
দ্বিকালং যঃ পঠেন্নিত্যং ধন ধান্য সমন্বিতঃ॥
ত্রিকালং যঃ পঠেন্নিত্যং মহাশত্রু বিনাশনম্।
মহালক্ষ্মী র্ভবেন্-নিত্যং প্রসন্না বরদা শুভা॥

BANGLADARSHAN.COM

[ইতি ইন্দ্রকৃত শ্রী মহালক্ষ্ম্যষ্টক স্তোত্রং সংপূর্ণম্]

শ্রী সুক্ত (বঙ্গানুবাদ সহ)

লক্ষ্মীপূজায় পাঠ করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র যা ঋগবেদের অন্তর্গত।

শ্রীসূক্তম্

[ঋগবেদীয় বাষ্কল শাখা (খিল) অংশে সংকলিত]

ওঁ হিরণ্যবর্ণাম্ হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ॥১॥

অনুবাদঃ হরি ওঁ, হে জাতবেদো! (সর্বজ্ঞ) অগ্নিদেব! আপনি হিরণ্যবর্ণরূপী সুন্দরী, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের হার পরিহিতা, চন্দ্রবৎ প্রসন্নাকান্তী স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীদেবীকে আমার জন্য আহ্বান করুন। (১)

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্॥২॥

অনুবাদঃ হে অগ্নে! সেই লক্ষ্মীদেবীর, যার কখনো বিনাশ হয় না এবং যার আগমনে আমি স্বর্ণ, গবাদিপশু, ঘোড়া এবং পুত্রাদি প্রাপ্ত করতে পারব; আমার জন্য তাকে আহ্বান করুন। (২)

অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মাদেবী জুষতাম্॥৩॥

অনুবাদঃ যার অগ্রে তেজস্বী ঘোড়া এবং সেই রথ মধ্যে দেবী স্বয়ং বিরাজমান থাকেন। হস্তিনাদ শুনে যিনি প্রসন্ন হন, সেই শ্রী দেবীকে আমি আহ্বান করছি। দেবী লক্ষ্মী আমার প্রাপ্ত হোক। (৩)

কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারাং আদ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পযন্তীম্।
পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বযেশ্রিয়ম্॥৪॥

অনুবাদঃ যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী, মৃদুমন্দ হাঁস্যকারিণী, স্বর্ণ দ্বারা আবৃত, কোমলমতি, তেজময়ী, পূর্নকামা, ভক্তনুগ্রহকারিণী, পদ্মাসনে বিরাজিতা পদ্মবর্ণা। সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমি এখানে আহ্বান করছি। (৪)

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ংলোকে দেব জুষ্টামুদারাম্।
তাং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যেঽলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে॥৫॥

অনুবাদঃ চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্রকান্তি, সুন্দরী দ্যুৎশালিনী, যশে দিপ্তীমতি, স্বর্গলোকে দেবগণ দ্বারা পুজিতা, উদারশীল, পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবীর আমি শরণাগত হচ্ছি। আমার দারিদ্রোতা দূর হোক। হে মাতা আমি তোমাকে শরণ্যরূপে বরণ করছি। (৫)

আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতিস্তববৃক্ষোথ বিল্ব:।
তস্য ফলানি তপসানুদন্তু মায়ান্তরায়শ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মী:॥৬॥

অনুবাদঃ সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপে, তোমারই তাপে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ মঙ্গলময় বিল্ববৃক্ষ (বেল গাছ) উৎপন্ন হয়েছে। এই বৃক্ষের ফল তোমারই অনুগ্রহে আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দারিদ্র্যতা দূর করুক। (৬)

উপৈতু মাং দেবসখ: কীর্তিশ্চমণিনা সহ।
প্রাদুর্ভুতো সুরাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্তিমৃধিদং দদাতু মে॥৭॥

অনুবাদঃ হে দেবী! দেবসখা কুবের ও তার মিত্র মণিভদ্র তথা প্রজাপতি দক্ষের কন্যা কীর্তি আমার প্রাপ্তি হোক। অর্থাৎ আমার ধন এবং যশ প্রাপ্তি হোক। আমি যে রাষ্ট্রে জন্মেছি, তার কীর্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান কর। (৭)

ক্ষুৎপপাসামলাং জেষ্ঠাং অলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্।
অভূতিমসমৃধিদং চ সর্বানির্ণুদ মে গৃহাত॥৮॥

অনুবাদঃ লক্ষ্মী দেবীর বড় বোন অলক্ষ্মী (দরিদ্রোতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী / অভিশপ্ত) যার জন্য ক্ষুধা-পিপাসায় মলিন- ক্ষীণশরীরে বিদ্যমান থাকে। সেই অলক্ষ্মী দূর হোক। হে দেবী! আমার ঘর হতে সমস্ত প্রকার দারিদ্র্য এবং অমঙ্গলকে দূর করো। (৮)

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরিং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥৯॥

অনুবাদঃ যার প্রবেশের দুয়ার সুগন্ধিত, যিনি দূষ্প্রাপ্য (যাকে সহজে প্রাপ্ত করা যায় না) তথা নিত্যপুষ্টা, যিনি প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেন, সমস্ত ভূতের স্বামীনী সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমি আহ্বান করছি। (৯)

মনস: কামমাকূতিং বাচ: সত্যমশীমহি।
পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রী: শ্রেয়তাং যশ:॥১০॥

অনুবাদঃ মনের কামনা, সংকল্প-সিদ্ধির এবং বচনের সত্যতা আমার প্রাপ্তি হোক। গবাদিপশু এবং বিভিন্ন অন্ন ভোগ্য পদার্থের রূপে তথা যশ রূপে শ্রী দেবী আমার এখানে আগমন করুক। (১০)

কর্দমেনপ্রজাভূতা ময়িসংভবকর্দম।
শ্রিয়ং বাসয়মেকুলে মাতরং পদ্মমালিনীম্॥১১॥

অনুবাদঃ লক্ষ্মীর পুত্র কর্দম এর সন্তান আমি। কর্দম ঋষি! আপনি আমার এখানে আবির্ভূত হন তথা পদ্ম ফুলের মালা পরিহিতা মাতা লক্ষ্মীদেবীকে আমার কুলে স্থাপিত করুন। (১১)

আপ স্রজন্তু সিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে।
নি চ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে॥১২॥

অনুবাদঃ জল স্নিগ্ধ পদার্থের সৃষ্টিকর্তা লক্ষ্মীপুত্র চিক্লীত! আপনিও আমার ঘরে বাস করুন এবং মাতা লক্ষ্মীদেবীকেও আমার কুলে নিবাস করান। (১২)

আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টি পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ॥১৩॥

অনুবাদঃ হে অগ্নিদেব! আদ্রস্বভাবা, কমলহস্তা, পুষ্টিরূপা, পীতবর্ণা, পদ্ম ফুলের মালা পরিহিতা, চন্দ্রমার সমান শুভ্রকান্তি দ্বারা যুক্তা, স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীদেবীকে আমার এখানে আহ্বান করুন। (১৩)

BANGLADARSHAN.COM

আর্দ্রাং য: করিণীং যষ্টীং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্।
সূর্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মী জাতবেদো ম আবহ॥১৪॥

অনুবাদঃ হে অগ্নিদেব! যিনি দুষ্টের দ্বারা নিগৃহীত হয়েও কোমল স্বভাব এর, যিনি মঙ্গলময়ীনী, অবলম্বন প্রদানকারী যষ্টিরূপা, সুবর্ণা, হেমমালিনী, সূর্যস্বরূপা তথা হিরণ্ময়ী, সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার এখানে আহ্বান করুন। (১৪)

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্॥১৫॥

অনুবাদঃ হে অগ্নিদেব! কখনো বিনষ্ট না হওয়া, সেই লক্ষ্মীদেবীকে আমার এখানে আহ্বান করুন। (১৫)

য: শুচি: প্রয়তোভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমন্বহম্।
সূক্তং পঞ্চদশর্চ চ শ্রীকাম: সততং জপেৎ।।

অনুবাদঃ যিনি লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভে ইচ্ছা করেন, তাকে প্রতিদিন পবিত্র এবং সংযমশীল হয়ে অগ্নিতে ঘি আহুতি দিয়ে তথা এই পনের ঋচ্ মন্ত্রের শ্রীসূক্ত নিরন্তর পাঠ করা উচিৎ।

ফলশ্রুতি:-

পদ্মাননে পদ্মউরূ পদ্মাক্ষি পদ্মসংভবে।
তন্মে ভজসি পদ্মক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্॥ ১

অনুবাদঃ হে লক্ষ্মীদেবী! তোমার শ্রীমুখ, উরু ভাগ, নেত্রাদি পদ্মের ন্যায়। তোমার উৎপত্তি পদ্ম হতেই হয়েছে। হে কমলনয়নী! আমি তোমার স্মরণ করছি, তুমি আমার প্রতি কৃপা কর। (১)

অশ্বদায়ৈ গোদায়ৈ ধনদায়ৈ মহাধনে।
ধনং মে লভতাং দেবি সর্বকামাংশ্চ দেহি মে॥ ২

অনুবাদঃ হে দেবী! অশ্ব, গাভী, ধন প্রদানে তুমি সমর্থ। তুমি আমাকে ধন প্রদান কর। হে মাতা! আমর সমস্ত কামনা পূরণ কর। (২)

পদ্মাননে পদ্মবিপত্রে পদ্মপ্রিয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি।
বিশ্বপ্রিয়ে বিষ্ণুমনোনুকূলে ত্বৎপাদপদ্মং ময়ি সংনিধত্স্বং॥ ৩

অনুবাদঃ হে দেবী! তুমি পদ্মমুখী, পদ্মাসনে বিরাজিতা, পদ্ম-দলের ন্যায় তোমার নেত্র, পদ্ম ফুল তোমার প্রিয়। সৃষ্টির সমস্ত জীব তোমার কৃপা লাভে ইচ্ছুক। তুমি সবাইকে তার মনের মত ফল প্রদান করে থাক। হে দেবী! তোমার চরণ-কমল সর্বদা আমার হৃদয়ে স্থিত। (৩)

পুত্রপৌত্রং ধনংধান্যং হস্তাশ্বাদিগবেরথম্।
প্রজানাং ভবসি মাতা আয়ুষ্মন্তং করোতু মে॥ ৪

অনুবাদঃ হে দবী! তুমি সৃষ্টির সমস্ত জীবের মাতা। তুমি আমাকে পুত্র-পৌত্র, ধন-ধান্য, হাতি-ঘোড়া, গাভী,ষাড়, রথ ইত্যাদি প্রদান কর। আমকে দীর্ঘায়ু প্রদান কর। (৪)

ধনমগ্নির্ধনং বায়ুর্ধনং সূর্যোধনং বসু।
ধনমিন্দ্রো বৃহস্পতির্বরুণং ধনমস্তু মে॥ ৫

অনুবাদঃ হে লক্ষ্মী! তুমি আমাকে অগ্নি, ধন, বায়ু, সূর্য, জল, বৃহস্পতি, বরুণ ইত্যাদির কৃপা দ্বারা ধনের প্রাপ্তি প্রদান করাও। (৫)

বৈনতেয় সোমং পিব সোমং পিবতু বৃতহা।
সোমং ধনস্য সোমিনো মহ্যং দদাতু সোমিন:॥ ৬

অনুবাদঃ হে বৈনতেয় পুত্র গরুড়! বৃত্তাসুরের বধকর্তা, ইন্দ্র ও অন্য সকল দেবতা যে অমৃত পান করেছে, আমাকে সেই অমৃতযুক্ত ধন প্রদান কর। (৬)

ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য ন লোভো নাশুভামতি:।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং শ্রীসূক্তং জপেত্॥ ৭

অনুবাদঃ এই শ্রী সূক্ত পঠনকারীর ক্রোধ, মৎসর, লোভ এবং অন্যান্য অশুভ কর্মে প্রবৃত্তি থাকে না। তিনি সৎকর্মের দিকে প্রেরিত হন। (৭)

সরসিজনিলয়ে সরোজহস্তে ধবলতরাংসুকগন্ধমাল্যশোভে।
ভগবতি হরিবল্লভে মনোজ্ঞে ত্রিভুবনভূতিকরি প্রসীদমহ্যম্॥ ৮

অনুবাদঃ হে ত্রিভুবনেশ্বরী! হে পদ্মনিবাসিনী! তুমি হাতে পদ্ম ধারণ করে থাক। সাদা, পরিচ্ছন্ন বস্ত্র, চন্দনযুক্ত মালা পরিহিতা হে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভগবতি! তুমি সবার মনকে জান। এই অভাগার প্রতি কৃপা কর। (৮)

বিষ্ণুপত্নীং ক্ষমাং দেবী মাধবী মাধবপ্রিয়াম্।
লক্ষ্মীং প্রিয়সখীং দেবীং নমাম্যচ্যুতবল্লভাম্॥ ৯

অনুবাদঃ ভগবান বিষ্ণুর পত্নী, মাধবপ্রিয়া, ভগবান অচ্যুতের প্রেয়সী, ক্ষমামূর্তি, লক্ষ্মীদেবী আমি তোমাকে বারংবার নমষ্কার করি। (৯)

মহাদেব্যৈ চ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্নৈ চ ধীমহি।
তন্নো লক্ষ্মী: প্রচোদয়াৎ॥ ১০

অনুবাদঃ আমি মহাদেবী লক্ষ্মীর স্মরণ করছি, বিষ্ণুপত্নি লক্ষ্মী আমার প্রতি কৃপা কর। হে দেবী আমাকে সৎকার্য প্রবৃত্তিতে প্রেরিত কর। (১০)

শ্রীবর্চস্বমাযুষ্যমারোগ্যমাবিধাচ্ছোভমানং মহীয়তে।
ধান্যং ধনং পশুং বহুপুত্রলাভং শতসংবৎসরং দীর্ঘমায়ুঃ॥

অনুবাদঃ শ্রী সূক্ত পাঠ কারী ব্যাক্তি শ্রী, তেজ, আয়ু, স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ হয়ে শোভিত থাকে। তিনি ধন-ধান্য, গবাদিপশু ও পুত্রবান হয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করে।

ॐ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

॥ইতি শ্রীসূক্তং সমাপ্তম্॥

‘মাতা লক্ষ্মী দেবীর অষ্টস্বরূপ’

তিনি ধনসম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ,, শ্রী, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী। তিনি বিষ্ণুর পত্নী। তার অপর নাম মহালক্ষ্মী, ইনি সত্ত্বগুণময়ী।জৈন স্মারকগুলিতেও লক্ষ্মীর ছবি দেখা যায়। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে লক্ষ্মীর অশেষ মাহাত্ম্য। লক্ষ্মী হলেন সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবী। তাই গৃহস্থ ঘরে লক্ষ্মীর পুজোর প্রথা প্রচলিত আছে। শাস্ত্র অনুসারে লক্ষ্মীর আটটি অবতার। বিশেষ ফললাভের জন্য বিশেষ লক্ষ্মীর পুজো করা বাঞ্ছনীয়।

দেবী লক্ষ্মী:-

প্রতিটি ব্যক্তি জীবনে সুখ-সম্পদের কামনা করে থাকে। ধন-সম্পদ লাভের জন্য তাঁরা যথাসাধ্য পরিশ্রমও করেন। আবার হিন্দু ধর্ম মতে লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী। তাই পরিশ্রমের পাশাপাশি লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করে ধন বৃদ্ধির চেষ্টা করেন অধিকাংশ ব্যক্তি। তবে সনাতন ধর্ম অনুযায়ী লক্ষ্মীর একটি নয় বরং ৮টি স্বরূপ রয়েছে এবং এই আটটি স্বরূপের পুজোর পৃথক পৃথক ফল লাভ করা যায়। লক্ষ্মীর আটটি স্বরূপের পুজো করলে ব্যক্তি তেজ, বল, সাহস, সৌন্দর্য এবং সমস্ত ধরনের সুখ লাভ করে। লক্ষ্মীর কোন স্বরূপের পুজো করলে কোন সমস্যার সমাধান হয় একটু জানি–

আদিলক্ষ্মী:-

লক্ষ্মীর প্রথম স্বরূপ আদিলক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মীর। তাঁর পুজো করলে সমস্ত ধরনের সুখ-সম্পদ লাভ করা যায়।

আদিলক্ষ্মী মন্ত্র

সুমনস বন্দিত সুন্দরি মাধবি, চন্দ্র সহোদরি হেমময়ে
মুনিগণ বন্দিত মোক্ষপ্রদায়নি, মঞ্জুল ভাষিণি বেদনুতে।
পঙ্কজবাসিনি দেব সুপূজিত, সদ্গুণ বর্ষিণি শান্তিযুতে
জয় জয়হে মধুসূদন কামিনি, আদিলক্ষ্মি পরিপালয় মাম্॥১॥

ধান্য লক্ষ্মী:-

ধনের দেবী লক্ষ্মীর পুজো করলে সাধকের জীবনের সমস্ত ধরনের আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়। তাঁর বাড়িতে কখনও অর্থাভাব থাকে না। লক্ষ্মী প্রসন্ন হলে নানান উৎস থেকে আয় হয়।

ধান্যলক্ষ্মী মন্ত্র

অহিকলি কল্মষ নাশিনি কামিনি, বৈদিক রূপিণি বেদময়ে
ক্ষীর সমুদ্ভব মঙ্গল রূপিণি, মন্ত্রনিবাসিনি মন্ত্রনুতে।
মঙ্গলদায়িনি অম্বুজ বাসিনি, দেবগণাশ্রিত পাদযুতে
জয় জয়হে মধুসূদন কামিনি, ধান্যলক্ষ্মি পরিপালয় মাম্॥২॥

ধৈর্য্য লক্ষ্মী

যে সাধক ঐশ্বর্য লক্ষ্মীর আশীর্বাদ লাভ করেন, তাঁরা সমাজে প্রচুর মান-সম্মান পেয়ে থাকেন। তাই সমাজে মান-সম্মান লাভের ইচ্ছা থাকলে লক্ষ্মীর এই স্বরূপের পুজো করা উচিত।

ধৈর্য্যলক্ষ্মী মন্ত্র

জযবরবর্ষিণি বৈষ্ণবি ভার্গবি, মন্ত্রস্বরূপিণি মন্ত্রময়ে
সুরগণ পূজিত শীঘ্র ফলপ্রদ, জ্ঞান বিকাসিনি শাস্ত্রনুতে।
ভবভযহারিণি পাপবিমোচনি, সাধু জনাশ্রিত পাদযুতে
জয় জযহে মধুসূদন কামিনি, ধৈর্যলক্ষ্মী পরিপালয মাম্॥৩॥

সন্তান লক্ষ্মী

সন্তান লক্ষ্মীর পুজো করলে সন্তান লাভ করা যায়। নিঃসন্তান দম্পতিদের ধন-ধান্যের দেবী লক্ষ্মীর এই স্বরূপের পুজো করা উচিত। এর ফলে সন্তান সুখ লাভ করা যায়।

সন্তানলক্ষ্মী মন্ত্র

অহিখগ বাহিনি মোহিনি চক্রিণি, রাগবিবর্ধিনি জ্ঞানময়ে
গুণগণবারধি লোকহিতৈষিণি, সপ্তস্বর ভূষিত গাননুতে।
সকল সুরাসুর দেব মুনীশ্বর, মানব বন্দিত পাদযুতে

জয় জয়হে মধুসূদন কামিনি, সন্তানলক্ষ্মী পরিপালয মাম্॥৪॥

গজ লক্ষ্মী:-

শাসন, সরকার ইত্যাদি সমস্ত ধরনের সুখের কামনা করলে, গজের ওপর অধিষ্ঠিত লক্ষ্মীর আরাধনা করা উচিত। কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে লক্ষ্মীর এই রূপ আশীর্বাদের চেয়ে কম কিছু নয়। গজ লক্ষ্মীর পুজো করলে ভালো ফসল উৎপন্ন হয়।

গজলক্ষ্মি

জয় জয় দুর্গতি নাশিনি কামিনি, সর্বফলপ্রদ শাস্ত্রময়ে
রধগজ তুরগপদাতি সমাবৃত, পরিজন মন্ডিত লোকনুতে।
হরিহর ব্রহ্ম সুপূজিত সেবিত, তাপ নিবারিণি পাদযুতে
জয় জয়হে মধুসূদন কামিনি, গজলক্ষ্মী রূপেণ পালয় মাম্॥৫॥

বিজয় লক্ষ্মী:-

বিজয় লক্ষ্মীর পুজোর ফলে যে কোনও ক্ষেত্রে জয় লাভ করা যায়। সবসময় শত্রু ভয় থাকলে বিজয় লক্ষ্মীর পুজো করা উচিত। তাঁর আশীর্বাদে শত্রু স্বয়ং পরাজয় স্বীকার করবে এবং আপনার সামনে মাথা নত করবে।

বিজয়লক্ষ্মী মন্ত্র

জয় কমলাসিনি সদ্গতি দায়িনি, জ্ঞানবিকাসিনি গানময়ে
অনুদিন মর্চিত কুমকুমধূসর, ভূষিত বাসিত বাদ্যনুতে।
কনকধরাস্তুতি বৈভব বন্দিত, শংকরদেশিক মান্যপদে
জয় জয়হে মধুসূদন কামিনি, বিজয়লক্ষ্মী পরিপালয় মাম্॥৬॥

বিদ্যালক্ষ্মী :

কলা ও বিজ্ঞানের জ্ঞান রূপ ধন প্রদানকারিনী লক্ষ্মী।

বিদ্যালক্ষ্মী মন্ত্র

প্রণত সুরেশ্বরি ভারতি ভার্গবি, শোকবিনাশিনি রত্নময়ে
মণিময ভূষিত কর্ণবিভূষণ, শান্তি সমাবৃত হাস্যমুখে।
নবনিধি দাযিনি কলিমলহারিণি, কামিত ফলপ্রদ হস্তযুতে
জয জয়হে মধুসূদন কামিনি, বিদ্যালক্ষ্মী সদা পালয মাম্॥৭॥

ধনলক্ষ্মী

লক্ষ্মীর অর্থ ও স্বর্ণদাত্রী রূপ। অর্থাৎ তিনি সাধককে সকল বৈষয়িক সুখ ও সমৃদ্ধি প্রদান করেন।

ধনলক্ষ্মী মন্ত্র

ধিমিধিমি ধিক্কিমি ধিক্কিমি দিক্কিমী দুন্দুভি নাদ সুপূর্ণময়ে।
ঘুমঘুম ঘুজ্জুম ঘুজ্জুম ঘুজ্জুম শঙ্খনিনাদ সুবাদ্যনুতে।
বেদ পুরাণেতিহাস সুপূজিত বৈদিক মার্গ প্রদর্শযুতে।
জয় জয় হে মধুসূদন কামিনী ধনলক্ষ্মী রূপেণ পালয় মাম্

ফলশ্রুতি:-

শ্লো॥ অষ্টলক্ষ্মী নমস্তুভ্যং বরদে কামরূপিণি।
বিষ্ণুবক্ষঃ স্থলা রূঢে ভক্ত মোক্ষ প্রদাযিনি॥
শ্লো॥ শঙ্খ চক্রগদাহস্তে বিশ্বরূপিণিতে জযঃ।
জগন্মাত্রে চ মোহিন্যৈ মংগলং শুভ মংগলম্॥

শ্রীলক্ষ্মীপূজার সম্পূর্ণ ফল পাওয়ার জন্য দেবীর অষ্টস্বরূপের পূজা করা বাঞ্ছনীয়। দেবীর অষ্টস্বরূপের কাছে মাথা নত করি ও তাঁকে শতকোটি বিনম্র প্রণতি করি।

BAN OM

BAN COM

BAN COM

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥